ক্রুসেড-১০
সর্প
কেল্লার
খুনী
আসাদ বিন হাফিজ

ক্রুসেড - ১০

সর্প কেল্লার খুনী

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩১৯৫৪০

ক্রুসেড - ১০

সর্প কেল্লার খুনী

[আবদুল ওয়াজেদ সালাফী অনূদিত আলতামাশ-এর 'দাস্তান ঈমান ফারুশোকী'র ছায়া অবলম্বনে রচিত]

প্রকাশক

আসাদ বিন হাফিজ
প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩১৯৫৪০

প্রথম প্রকাশ মে ২০০১
প্রচ্ছদ :
প্রীতি ডিজাইন সেন্টার
মুদ্রণ :
প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস

মূল্যঃ ৫০.০০

CRUSADE-10
Sharpo Kellar Khuni
[A heroic Adventure of the great Salahuddin]
by
Asad bin Hafiz
Published by
Pritee Prokashon
435 / ka Bara Moghbazar, Dhaka-1217
Phone : 8321758, 8319540, Fax: 880-2-8319540
Published on: May 2001

PRICE : ৫০.00

ISBN 984-581-181-7

ক্রুসেড

খৃস্টান ও মুসলমানদের মরণপন লড়াই কাহিনী

ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার
চক্রান্তে মেতে উঠলো খৃস্টানরা।
একে একে লোমহর্ষক অসংখ্য সংঘাত ও সংঘর্ষে
পরাজিত হয়ে বেছে নিল ষড়যন্ত্রের পথ।
মুসলিম দেশগুলোতে ছড়িয়ে দিল গুপ্তচর বাহিনী।
ছড়িয়ে দিল মদ ও নেশার দ্রব্য।
ঝাঁকে ঝাঁকে পাঠাল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুন্দরী গোয়েন্দা।
বড় বড় সেনা অফিসার এবং আমীর ওমরাদের হারেমগুলোতে
ঢুকিয়ে দিল গায়িকা ও নর্তকী।
ভাসমান পতিতা ছড়িয়ে দিল সর্বত্র।
মদ, জুয়া আর বেহায়াপনার স্রোত বইয়ে দিল শহরগুলোতে।

একদিকে সশস্ত্র লড়াই
অন্যদিকে কুটিল সাংস্কৃতিক হামলা
এ দু'য়ের মোকাবেলায় রুখে দাঁড়াল মুসলিম বীর শ্রেষ্ঠরা।
তারা মোকাবেলা করল এমন অবিশ্বাস্য ও শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনার,
মানুষের কল্পনাকেও যা হার মানায়।

সেই সব শিহরিত, রোমাঞ্চিত ঘটনার বর্ণনায় ভরপুর
ইতিহাস আশ্রিত রহস্য সিরিজ

ক্রুসেড

এ সিরিজের অন্যান্য বই

- গাজী সালাহউদ্দীনের দুঃসাহসিক অভিযান
- সালাহউদ্দীন আয়ুবীর কমান্ডো অভিযান
- সুবাক দুর্গে আক্রমণ
- ভয়ংকর ষড়যন্ত্র
- ভয়াল রজনী
- আবারো সংঘাত
- দুর্গ পতন
- ফেরাউনের গুপ্তধন
- উপকূলে সংঘর্ষ

এ সিরিজের পরবর্তী বই

চারদিকে চক্রান্ত

আগামী মাসে বেরুচ্ছে অপারেশন সিরিজের ৪র্থ বই

তাওহীদুল ইসলাম বাবু রচিত

হাইনান দ্বীপে অভিযান

দামেশকে সুলতান আইয়ুবী বীর বেশে প্রবেশ করলেন, সঙ্গে মাত্র সাতশ অশ্বারোহী। কি করে এই স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে এমন বিপুল বিজয় সাধন করলেন তিনি, সে এক বিস্ময়ের ব্যাপার। এ ঐতিহাসিক বিজয়ের পেছনে ছিল সুলতান আইয়ুবীর জান-কবুল অগ্রগামী সৈন্যদের অবিস্মরণীয় ভূমিকা।

এ জান-কবুল অগ্রগামী বাহিনী ছিল সেসব গোয়েন্দাদের, যাদের কেউ বণিকের বেশে, কেউ নিরীহ পথচারী সেজে, কখনো একাকী, কখনো দু'জন, কখনো তিন বা চার জনের ছোট ছোট দলে দামেশকে প্রবেশ করেছিল।

দামেশকের সাধারণ মানুষের সাথে একাকার হয়ে মিশে গিয়েছিল তারা। কুলি-মজুর থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী, পথচারী, এমনকি সেনা ছাউনিতেও ছদ্মবেশে ঢুকে পড়েছিল এসব গোয়েন্দারা। পরিবেশ পরিস্থিতিকে সুলতান আইয়ুবীর অনুকূলে আনার জন্য জনমতকে প্রভাবিত করা এবং সেনাবাহিনীর যেসব সদস্য সুলতানের পক্ষে আছে তাদেরকে সংগঠিত করাই ছিল তাদের মূল কাজ।

এভাবে সুলতানের আগমনের পূর্বেই দামেশকের পরিস্থিতি তারা সুলতানের সপক্ষে নিয়ে আসে। সুলতান আইয়ুবী দামেশকের ফটকে পৌঁছলে সুলতানের জন্য দামেশকের দরজা খুলে দেয়ার যে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয় জনগণের পক্ষ

থেকে, মূলত তারাই সে চাপের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।
এসব গোয়েন্দাদের প্রায় সবাই ছিল চৌকস ও বুদ্ধিদীপ্ত। আলী বিন সুফিয়ান গোয়েন্দাগিরিতে ঝানু এবং যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শীদের বাছাই করে এ অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। যে কোন ধরনের পরিস্থিতিতে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ পেয়েছিল এরা সুলতানের কাছ থেকে।
প্রতিটি গোয়েন্দাই ছিল সব ধরনের অস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত এবং সব রকমের বিপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে পটু। তারা কেবল বুদ্ধিদীপ্ত এবং বিচক্ষণই ছিল না, তারা দুঃসাহসী এবং বেপরোয়াও ছিল। আল্লাহর রাহে জীবন বিলিয়ে দেয়ার উদগ্র কামনা ছিল সবার অন্তরে। শাহাদাত লাভের জন্য তাদের প্রতিটি অন্তর ছিল উদগ্রীব।
তাই তারা অবলীলায় এমন সব ভয়াবহ ঝুঁকি গ্রহণ করতে পারতো, যা সাধারণভাবে কেউ চিন্তা করতেও ভয় পেতো। এ আবেগ শুধু সামরিক ট্রেনিং দিয়ে সম্ভব নয়, এর জন্য প্রয়োজন হতো নৈতিক প্রশিক্ষণ।
আলী তার বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে এমনভাবে তৈরী করতেন, যাতে তাদের মধ্যে আল্লাহর প্রতি অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস জন্মে, দ্বীনের প্রতি সৃষ্টি হয় অপরিসীম ভালবাসা ও মহব্বত। হৃদয় ভরপুর থাকে শাহাদাতের তামান্নায়।
ইসলামের জন্য নানা রকম ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে শরীক হতে হতো ওদের। এ চেতনার কারণেই এসব অভিযানে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়তো জেহাদের আবেগময় জযবা নিয়ে। এমনি একদল নিবেদিতপ্রাণ যুবকদের নিয়েই সুলতান আইয়ুবী তার এই কমাণ্ডো বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন।

সুলতান আইয়ুবী তাঁর বাহিনী নিয়ে দামেশক যাত্রা করার আগেই বাছাই করা এ কমাণ্ডো ও গোয়েন্দাদের দামেশক যাত্রা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওরা রওনা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হলে তাদের সামনে এক আবেগময় ভাষণ দিলেন তিনি।

ভাষণের শেষ প্রান্তে এসে তিনি বললেন, 'যদি দামেশকের সেনাবাহিনী মোকাবেলার জন্য ময়দানে নেমে আসে, তাহলে তোমাদের প্রতি আমার নির্দেশ রইল, শহরের মধ্যে লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে দেবে। উত্তেজিত জনগণকে নিয়ে ছুটে আসবে ফটক প্রাঙ্গণে। ভেতর থেকে গেট খুলে দিতে চেষ্টা করবে শহরের।'

জনমতকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে এদের কোন জুড়ি ছিল না। সুলতানের পক্ষের লোকদের সংগঠিত করে সুবিশাল জঙ্গী মিছিলের মাধ্যমে খলিফার অনুগত লোকদের মনে ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করে, সুলতান ফটকে পৌঁছার আগেই সুলতানের এসব জানবাজ কমাণ্ডো ও গোয়েন্দারা শহরের অবস্থান নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়।

এক ফরাসী কথাশিল্পী তার এক কাহিনীতে এ যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'সুলতান আইয়ুবীর যুদ্ধবাজ কমাণ্ডোরা স্বাভাবিক মানুষ ছিল বলে মনে হয় না। ইসলামের ধর্মীয় আবেগ তাদের উন্মাদ বানিয়ে ফেলেছিল! নইলে জেনেশুনে এভাবে হাসতে হাসতে মরণ সাগরে ঝাঁপ দিতে পারতো না ওরা। জেহাদী জযবা এক ধরনের মানসিক রোগ। পতঙ্গ যেমন আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ছুটে যায়, এ রোগে ধরলে মানুষও তেমনি ছুটে যায় মরণ সাগরে ঝাঁপ দিতে।'

তাঁর হয়তো জানা নেই, এ জেহাদী জযবাই একজন মানুষকে মুজাহিদে রূপান্তরিত করে। এ আবেগের সাথে পরিচয় নেই বলেই ফরাসী লেখক তাকে 'ধর্মীয় উন্মাদনা' ও 'মানসিক রোগ' বলে খাটো করে দেখেছেন। কিন্তু তিনি জানেন না, মুসলমানের কাছে এ আবেগ বা জযবার মূল্য কত? এর স্বাদ কত মধুর ও তৃপ্তিদায়ক! প্রকৃত মুসলমানের জীবন তো ধন্য হয় এই আবেগ ও জযবাকে সম্বল করেই!

এ জানবাজ গোয়েন্দাদেরই নেতা আলী বিন সুফিয়ান। তার দুই সহকর্মী হাসান বিন আবদুল্লাহ ও জায়েদানকে তিনি গড়ে তুলেছেন নিজ হাতে। যুদ্ধ কৌশলে তারা এতটাই পারদর্শী ও দক্ষ হয়ে উঠে যে, এখন সেনানায়করাও তাদের কাছে শিখতে পারবে। আলী তাদেরকেই পাঠিয়েছিলেন দামেশকে।

সুলতান আইয়ুবী দামেশক রওনা হওয়ার আগে আলীকে বললেন, 'আলী, কায়রোর আভ্যন্তরীণ অবস্থা ভাল না। এ অবস্থায় কায়রোকে অরক্ষিত রেখে অভিযানে বের হওয়া আমার সাজে না। কিন্তু ওস্তাদ জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীর আহাজারী এবং মিল্লাতের দুর্দিন ডাকছে আমাকে। আমাকে দামেশকে যেতেই হবে। আমি চাই, আমি যে কয়দিন কায়রোতে অনুপস্থিত থাকবো, তুমি থাকবে কায়রোতে। খৃস্টান ক্রীড়নকদের হাত থেকে দামেশকে মুক্ত করে আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এর হেফাজতের জিম্মা থাকবে তোমার ওপর। মিশরে খৃস্টান সন্ত্রাসীদের তৎপরতা আশংকাজনক হারে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সে কারণে তোমাকে খুবই হুঁশিয়ার থাকতে হবে।'

এ কারণেই সুলতানের সাথে অভিযানে আসতে পারেননি আলী। পরিবর্তে সুলতানকে সামগ্রিক সহায়তাদানের জন্য হাসান বিন আবদুল্লাহকে সুলতানের আগেই দামেশকের পথে পাঠিয়ে দিলেন। দামেশকে সুলতানের জানবাজ গেরিলা ও গোয়েন্দাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলো এই হাসান বিন আবদুল্লাহ।

খৃস্টানদের তল্পীবাহক কতিপয় স্বার্থপর আমীর ষড়যন্ত্র করে জঙ্গীর নাবালক সন্তান আল মালেকুস সালেহকে খলিফা ঘোষণা করলে মুসলিম মিল্লাতের স্বার্থে জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী সুলতান আইয়ুবীকে দামেশক অভিযানের আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। এ আবেদনে সাড়া দিয়ে সুলতান যখন দামেশক এসে পৌঁছলেন তখন সেখানকার বেশীর ভাগ সৈন্যই কমাণ্ডার তাওফীক জাওয়াদের সেনা কমাণ্ডে ছিল। খলিফার দেহরক্ষী রেজিমেন্ট, পুলিশ ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনী অবশ্য তার নেতৃত্বে ছিল না। এরা ছাড়া মূল সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যই সেনাপতি জাওয়াদের নেতৃত্বে সুলতান আইয়ুবীর আনুগত্য কবুল করে নিলে সুলতান এসব সৈন্যদেরকে তাঁর নিজ বাহিনীর সাথে একীভূত করে নিলেন।

দামেশকে আইয়ুবীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে তথাকথিত খলিফা এবং তার মন্ত্রণাদাতা ওমরারা দামেশক ছেড়ে পালিয়ে গেল। তাদের সাথে গেল তাদের প্রতি অনুগত সৈন্য ও খলিফার দেহরক্ষী বাহিনী।

তাদের ভয় এবং আশংকা ছিল, সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যরা তাদের পিছু ধাওয়া করবে। কিন্তু সুলতান আইয়ুবী তা করলেন না। সেনাপতিদের কেউ কেউ পালিয়ে যাওয়া খলিফা ও

আমীরদের পিছু ধাওয়া করার অনুমতি চাইলে তিনি তাদের বারণ করলেন।

তারা আশংকা প্রকাশ করে বললো, 'কিন্তু ওরা আবার ঐক্যবদ্ধ হতে পারলে বাইরের সাহায্য নিয়ে অভিযান চালাতে পারে!'

আরেকজন বললো, 'খৃস্টানরা তো ওদের সাহায্য করার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়েই আছে!'

সুলতান ওদের থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি কখনও অন্ধকারে পথে চলি না। আপনারা অস্থির হবেন না। ওরা কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং কারা কারা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে আমি তা দেখতে চাই। আমার চোখ ও কান ওদের সাথেই সারাক্ষণ ঘোরাফেরা করছে।

ঐ হতভাগারা এত তাড়াতাড়ি আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে পারবে না। আমি শুধু দেখতে চাই, ক্রুসেড বাহিনীর দৃষ্টি কোন্ দিকে? তারা কি মিশরের দিকে নজর দেয়, না দামেশকের দিকে, ওটাই এখন দেখার বিষয়।'

সুলতানের কথার ওপর আর কথা চলে না, তাই সবাই চুপ করে গেল। সুলতান খানিক বিরতি দিলেন। একটা গুমোট নিস্তব্ধতা বয়ে গেল সবার ওপর দিয়ে।

নিস্তব্ধতা ভাঙলেন সুলতান নিজেই। বললেন, 'সম্ভবত ওরাও অপেক্ষা করছে, আমি কি পদক্ষেপ নেই তা দেখার জন্য। এমনও হতে পারে, তারা আমার চাল বুঝেই তাদের চাল চালবে। অস্থির হওয়ার কিছু নেই। আপনারা সৈন্যদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিতে থাকুন, পুরোদমে যুদ্ধের মহড়া চালাতে থাকুন। সময় এলে গাদ্দার আমীরদের শায়েস্তা করার জন্য আমি ওদেরকে আপনাদের হাতেই তুলে দেবো।'

সুলতান আইয়ুবী যাদেরকে তাঁর চোখ ও কান বলেছিলেন, তারা আর কেউ নয়, আলীর গোয়েন্দা বিভাগের সেই জানবাজ বাহিনী। এদের অধিকাংশই মিশরের বাসিন্দা, তবে সবাই নয়, এ অঞ্চলেরও বেশ কিছু সদস্য আছে এ দলে।

খলিফা আল মালেকুস সালেহ ও তাঁর আমীর ওমরারা দামেশক থেকে পালানোর সময় তাদের সাথে সুলতানের এসব গোয়েন্দাদের কেউ কেউ তাদের সঙ্গে পালিয়ে যায়। এই পলাতকদের সংখ্যাও মোটেই কম ছিল না।

সমস্ত আমীর, উজির, কিছু জমিদার, প্রশাসনের অনেক অফিসার ও কর্মচারী, যারা খলিফার পক্ষে ছিল, সবাইকেই পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেন আইয়ুবী। পলাতকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যার মত পালিয়েছিল। এই বিশৃংখলারই সুযোগ নেয় আলীর গোয়েন্দারা। তারা সহজেই মিশে যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের সাথে।

খলিফা আল মালেকুস সালেহ ও তাঁর পোষ্য আমীররা প্রতিশোধের জন্য কি ধরনের তৎপরতা চালায় এটা দেখাই তাদের উদ্দেশ্য। সেই সাথে খৃস্টানরা তাঁকে কেমন সাহায্য দেয়, কিভাবে দেয় তাও লক্ষ্য করার দায়িত্ব ছিল তাদের ওপর। হাসান বিন আবদুল্লাহ নিজের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার ওপর নির্ভর করে সুলতান বা আলীর সাথে পরামর্শ ছাড়াই এসব গোয়েন্দাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে পলায়নপর লোকদের সঙ্গী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলো। সে ভাল করেই জানতো, তার এই সিদ্ধান্ত এক সময় অবশ্যই সুফল বয়ে আনবে। পরে

সুলতানকে এ ব্যাপারে অবহিত করলে তিনি খুবই খুশী হন এবং সন্তোষ প্রকাশ করে তার পিঠ চাপড়ে দেন।

এ গোয়েন্দাদেরই একজন মাজেদ বিন মুহাম্মদ হেজাযী। অত্যন্ত সুপুরুষ ও সুন্দর চেহারার যুবক। শারীরিক গঠন মাঝারী, তবে সুগঠিত। আল্লাহ তার মুখে এমন মাধুর্য দান করেছিলেন যে, তার কথা যাদুর মত প্রভাব বিস্তার করতো।
গোয়েন্দাদের প্রায় সবাই দক্ষতা ও গুণাবলীতে একই রকম হলেও মাজেদ বিন মুহাম্মদ ছিল বিস্ময়করভাবে ব্যতিক্রম। তার নৈপূণ্য ও দক্ষতা ছিল অতুলনীয়।
গোয়েন্দাদের প্রায় সবাই সুন্দর এবং সুগঠিত স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল। তদের এ সুন্দর স্বাস্থ্য ও লাবণ্যের একটি বিশেষ কারণ ছিল, তারা কেউ নেশা করতো না, অলস এবং আরামপ্রিয় জীবন যাপন করতো না। নিয়মিত ব্যায়াম এবং শারীরিক ও মানসিক প্রশিক্ষণের কারণে তাদের চেহারায় সব সময় প্রশান্তির প্রলেপ মাখা থাকতো।
তাদের চরিত্রের দৃঢ়তা, ইস্পাতের মত অনড়, অটল মনোবল এবং প্রবল ও অফুরন্ত ইচ্ছাশক্তির মূলে ছিল ইসলাম। ইসলামী আদর্শের পরিপূর্ণ জ্ঞান ও অনুশীলন তাদেরকে দিয়েছিল এক অনড় দৃঢ়তা। তাদের কথা ও কাজে প্রকাশ পেতো সে দৃঢ়তার ছাপ।
মাজেদ বিন মুহাম্মদ হেজাযী কাজে কর্মে তার সঙ্গীদের চাইতেও চৌকস এবং ইস্পাত কঠিন ছিল। হৃদয় ছিল চেহারার চাইতেও অনুপম সুন্দর ও মহত। এ রূপ ও সৌন্দর্য নিয়েই সে দামেশক থেকে পালাচ্ছিল।

একটি আরবী ঘোড়ার ওপর বসেছিল সে। তার কোমরে ঝুলছিল সুদৃশ্য তলোয়ার। ঘোড়ার জ্বীনের সাথে বাঁধা ধারালো বর্শা চমকাচ্ছিল রোদের কিরণ লেগে। ঘোড়া এগিয়ে যাচ্ছিল ধীর গতিতে। আর সে উদাস দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিল দূর দিগন্তে।

একাকী পথ চলছে মাজেদ হেজাযী। যাচ্ছে হলবের দিকে। পথে অনেক লোকই চোখে পড়ল তার। অনেকে তার মত হলবের দিকেই যাচ্ছে। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে এমন একজনকেও বেছে নিতে পারলো না, যার সাথে পথ চলা যায়, যাকে সফর সঙ্গী করা যায় নিঃশঙ্ক চিত্তে।

সে মনে মনে একজন সম্ভ্রান্ত সহযাত্রী খুঁজছিলো। খুঁজছিলো এমন সহযাত্রী, যে তার মিশনের জন্য ফলপ্রসূ হতে পারে। এমন সহযাত্রী সে-ই হতে পারে, যে লোক উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার, আমীর বা খলিফা আল মালেকুস সালেহের নিকটাত্মীয়, বন্ধু বা আপনজন।

খলিফা আল মালেকুস সালেহকে খুঁজে ফিরছিল তার চোখ ও মন। কয়েকজনকে জিজ্ঞেসও করলো, খলিফা কোন দিকে গেছে জানে কিনা। কিন্তু কেউ খলিফার সন্ধান দিতে পারল না।

সে ভাল মতই জানতো, আল মালেকুস সালেহ তার পিতা নূরুদ্দিন জঙ্গীর গুণ বা সাহস কোনটাই পায়নি। খলিফার গুণ-বৈশিষ্ট্যেরও ছিটেফোটা নেই তার মধ্যে। সে এগারো বছরের এক চঞ্চল বালকমাত্র। তাকে খৃস্টানদের চক্রান্তে সুযোগ সন্ধানী ও লোভী আমীররা আপন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য রাজ্যের সিংহাসনে বসিয়েছে। নামে মাত্র খলিফা বালক সালেহ, প্রকৃত

শাসক সেই স্বার্থবাদী আমীররা।
সে চিন্তা করে দেখলো, এ নাবালক খলিফার পক্ষে একা কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। কোথায় যেতে হবে, কি করতে হবে, তাই তো তার জানা থাকার কথা নয়!
ক্ষমতা হারা হলেও সে ঘোষিত খলিফা। ফলে চক্রান্তকারীরা কিছু করতে চাইলে অবশ্যই তাকে সামনে রাখবে। নিশ্চয়ই এখনো সে আমীর, উজির এবং সভাষদবর্গ পরিবেষ্টিত হয়েই পথ চলছে। আর সে কাফেলার সাথে আছে রাজকীয় ধন-দৌলত ও অর্থসম্পদ বোঝাই উটের সারি।
মাজেদ হেজাযী মনে মনে ভাবছিলো, যদি সে কাফেলার সন্ধান পাই, তবে আল মালেকুস সালেহের ভক্ত হয়ে সেই কাফেলার সাথে যুক্ত হয়ে যাবো।
একবার সে কাফেলার দেখা পেলে কি করতে হবে জানা আছে তার। কি করে অচেনা লোকের আপন হওয়া যায়, কি করে তাদের মনের কথা বের করে আনা যায়, সেসব কৌশল অন্যদের চাইতে ভালই রপ্ত করেছে সে।
কিন্তু কোথায় সে কাফেলা? তার শূন্য দৃষ্টি বার বার এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করলো। কিন্তু কাঙ্খিত কাফেলা, নিদেনপক্ষে সঙ্গী করার মত পছন্দসই কোন ব্যক্তিকেও সে খুঁজে পেলো না।

সামনে পাহাড়ী এলাকা। পাহাড়ের পাদদেশে শস্যক্ষেত ও ফলের বাগান। একটু বিশ্রামের আশায় সেই বাগানের এক গাছের নিচে বসলো মাজেদ।
অল্প দূরে এক জায়গায় দু'টি ঘোড়া দেখতে পেলো। ওদিকে

তাকাতেই তার একটু উপরে সবুজ ঘাসের ওপর একজন লোককে শুয়ে থাকতে দেখলো। দৃষ্টি আরেকটু উপরে তুলতেই তার নজর পড়লো একটি মেয়ে। মেয়েটিও তারই মত শুয়ে আছে।

ওখান থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সে গাছের নিচে শুয়ে পড়লো। শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবছে, হঠাৎ একটি ঘোড়া বিকট শব্দে ডেকে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে শোয়া থেকে উঠে বসলো ঘোড়ার পাশে শায়িত লোকটি। উঠে বসতেই তার নজর পড়লো মাজেদ হেজাযীর ওপর। মাজেদ হেজাযীও ঘোড়ার ডাক শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছিল সেদিকে, চোখাচোখি হয়ে গেল দু জনের। লোকটির পোশাক-পরিচ্ছদ বলছিল, সে কোন খান্দানী বংশের লোক।

মনে হয় সে লোকও মনে মনে কোন পছন্দসই সফর সঙ্গী খুঁজছিল। মাজেদ হেজাযীকে দেখে তার পছন্দ হয়ে গেল এবং ইশারায় তাকে কাছে ডাকলো।

মাজেদ হেজাযী সাড়া দিল তার ডাকে। সে শোয়া থেকে উঠে ওদের দিকে এগিয়ে গেল। কাছে গিয়ে অপরিচিতের সাথে মুছাফাহ করলো।

মেয়েটিও ততক্ষণে উঠে বসেছে। ওর বয়স বেশী নয়। দেখলে মনে হয়, কৈশোর উত্তীর্ণ এক নবীন যুবতী। লাবন্য ও সৌন্দর্য মাখামাখি হয়ে লেপ্টে আছে মেয়েটির অঙ্গ জুড়ে। গলায় হীরের হার। পোশাকে জৌলুসের ছাপ। এরা যে সাধারণ কেউ নয়, তা কাউকে বলে দিতে হয় না।

লোকটির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মাজেদ এক পলক

তাকিয়েই বুঝে ফেললো, এরা কারা।
'তুমি কে?' লোকটি জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি দামেশক থেকে আসছো?'
'হ্যাঁ, আমি দামেশক থেকেই এসেছি!' মাজেদ বললো, 'কিন্তু এখন দেয়ার মত কোন পরিচয় নেই। ভাগ্যই এখন একমাত্র পরিচয়।' তার কণ্ঠ থেকে একরাশ হতাশা ঝড়ে পড়লো। হতাশ কণ্ঠেই সে প্রশ্ন করলো, 'আপনারা কোথায় যাবেন?'
'মনে হয় আমরা একই পথের পথিক।' লোকটি মুচকি হেসে উত্তর দিল, 'ধরো, তোমারই মত মঞ্জিলহীন মুসাফির।'
কথা বলতে বলতে লোকটি ভাল করে তাকালো মাজেদ হেজাযীর দিকে। বললো, 'আমি কি ধরে নেবো, ভাগ্যই তোমার মত যুবককে আমাদের সঙ্গী বানিয়ে দিয়েছে?'
'অপরিচিত যাকে-তাকে সফর সঙ্গী করা ঠিক নয় সাহেব। বিশেষ করে যার সাথে এমন সুন্দরী মেয়ে থাকে, আর সে মেয়ের গলায় থাকে এমন মূল্যবান হার।' মেয়েটির গলার দিকে ইঙ্গিত করলো সে।
লোকটি এতে মোটেও বিব্রত না হয়ে বললো, 'তোমার মত সঙ্গী পাওয়া আসলেও ভাগ্যের ব্যাপার। বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসী সঙ্গী বিপদের বন্ধু। সাহস কেমন আছে জানি না, তবে বুদ্ধি যে সতেজ তা তো দেখতেই পাচ্ছি!'
এবার মাজেদ হেজাযীও হেসে দিল। বললো, 'আপনি কি করে আমাকে আস্থাভাজন ভাবলেন, আমি খারাপ লোকও তো হতে পারি!'
'সে তোমার চেহারাতেই লেখা আছে। শোন, আমাদের মত তুমিও আইয়ুবীর তাড়া খেয়ে দামেশক ছেড়েছো। বিপদগ্রস্ত

লোকরা সব সময়ই একে অন্যের সহায়ক হয়। বলতে পারো, আইয়ুবীই আমাদের পরস্পরকে বন্ধু বানিয়ে দিয়েছে।'

'এটা আপনি ঠিকই বলেছেন। অবশ্যই আমরা একে অন্যকে সাহায্য করবো। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, জীবন দিয়ে হলেও আমি আপনাদের সাহায্য করবো।'

'আইয়ুবী কি আমাদের তাড়া করতে পারে? তুমি কি তেমন কোন আভাস পেয়েছো?'

'তাড়া করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তার সাথে সৈন্য খুব কম বলে হয়তো সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য পাঠাতে পারেনি। শহরের নিয়ন্ত্রণ আয়ত্বে এলেই সে আমাদের খুঁজে বের করার জন্য চারদিকে সৈন্য পাঠিয়ে দেবে।'

'খুবই দুশ্চিন্তার কথা!'

'কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা!'

'কি?'

'একটু আগে আমি রাস্তায় দুটো লাশ পড়ে থাকতে দেখেছি। শুনেছি ওরা ডাকাতদের হাতে মারা গেছে। দামেশক থেকে পলাতক লোকদের ওপর হামলা করতে শুরু করেছে ডাকাতরা, এটা খুবই ভয়ের কথা। কারণ, আমরা যারা পালাচ্ছি, তারা সবাই পরস্পর বিচ্ছিন্ন। অনেকেই সহায় সম্পদ সঙ্গে নিয়ে পালাচ্ছি। ডাকাতদের জন্য এ এক সুবর্ণ সুযোগ। আমাদের জান-মাল ছিনিয়ে নেয়ার এ সুযোগ ওরা হাত ছাড়া করবে বলে মনে হয় না।'

মাজেদের কথা শুনে মেয়েটির আকর্ষণীয় চেহারা হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে তার সঙ্গীর দিকে তাকালো ভয়ার্ত ও করুণ চোখে। লোকটির অবস্থাও ভাল নয়। তার মুখের হাসি

মিলিয়ে গিয়ে সেখানে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়লো।
'তুমি তো আমাদের বড় দুর্ভাবনায় ফেলে দিলে যুবক!'
'না, না, ঘাবড়ানোর কিছু নেই। তবে সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকা দরকার। সাবধান থাকলে অনেক বিপদই এড়ানো যায়।'
'কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, আইয়ুবী আর ডাকাতদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয়েই লুটেরা, খুনী এবং নারীদের ইজ্জত লুণ্ঠনকারী। এদের কারো মধ্যেই কোন দয়ামায়ার চিহ্নও নেই।'
'ঠিক বলেছেন। ইনি আপনার কি হয়?' মেয়েটির দিকে ইশারা করে জানতে চাইল মাজেদ।
'ও আমার স্ত্রী!'
'দামেশকে আর কয়জন স্ত্রী ছেড়ে এসেছেন?' মাজেদ হেজাযী আবার জিজ্ঞেস করলো।
'চার জন!'
'আল্লাহর হাজার শুকুর যে, আপনি আপনার পঞ্চম স্ত্রীকে নিয়ে নিরাপদে শহর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন!'
'তিরস্কার করছো! আমি তো তাও একজন স্ত্রী সঙ্গে এনেছি, কিন্তু তুমি তো তাও আনোনি!'
'কোন নারীকে নিয়ে শহর ছাড়ার মত অবস্থা আর নেই। তাছাড়া....'
লোকটি তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি আইয়ুবীর সৈন্যদের কি অবস্থায় দেখে এসেছো? তারা কি শহরে লুটতরাজ শুরু করে দিয়েছে?'
'হ্যাঁ!' মাজেদ হেজাযী বললো, 'সেখানে এখন ভয়ানক লুটপাট

চলছে। আমি .... '
'দামেশকের কোথায় তোমার বাড়ি? সেখানে তুমি কি করতে?'
'সে পরিচয় আমি কাউকে বলতে চাই না।'
'বুঝেছি, তুমি আমাদের বিশ্বাস করতে পারছো না। ঠিক আছে, আস্থা না এলে বলার দরকার নেই। তবে বললেও তোমার কোন ক্ষতি আমাদের দিয়ে হতো না।'
'না, না, কি বলছেন আপনি! আমি মোটেই আপনাদের অবিশ্বাস করছি না। আমার পরিচয় শুনতে আপনাদের ভাল লাগবে না বলেই আমি ইতস্তত করছি।'
'কি যে বলো! তুমি যা- তাই তোমার পরিচয়। নিজের আসল পরিচয় প্রকাশে কোন রকম হীনমন্যতা থাকা উচিত নয় কারো। তুমি নিঃসঙ্কোচে তোমার পরিচয় বলতে পারো, আমরা কিছুই মনে করবো না।'
'আমি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সেনাদলের একজন সালার।'
সঙ্গে সঙ্গে লোকটার মুখের হাসি অদৃশ্য হয়ে গেল। কম্পিত কণ্ঠে বললো, 'আমাদের সাথে যে টাকাকড়ি আছে সব তুমি নিয়ে যাও! কিন্তু আমাদের কোন ক্ষতি করো না! তোমার কাছে আমি করজোড়ে প্রার্থনা করছি, আমাদের ওপর রহম করো, দয়া করে একটু প্রাণ ভিক্ষা দাও!'
মাজেদ হেজাযী হো হো করে হেসে উঠলো। বললো, 'অর্থ সম্পদ ও নারীর চিন্তা মানুষকে কাপুরুষ ও দুর্বল বানিয়ে দেয়। আমি বেঁচে থাকতে কেউ আপনাদের গায়ে আঁচড়ও দিতে পারবে না। আর সম্পদের কথা বলছেন? এ সম্পদ আপনাদের। কেউ তা ছিনিয়ে নিতে চাইলে এ তলোয়ার তার জবাব দেবে। আসলে আপনাদের কাছে এখনো আমার আসল পরিচয়

বলতেই পরিনি!'

'মুহতারাম! আমাকে বলুন আপনি কে? দামেশকে আপনি কি পদে ছিলেন এবং এখন আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'আমি সত্যি কথাই বলেছি, আমি আইয়ুবীর সৈন্য ঠিকই, তবে পলাতক। আসলে আমি জঙ্গীর সৈন্য। তিনি আমাকে আইয়ুবীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। জঙ্গীর নুন খেয়েছি আমি, আজ মরহুম জঙ্গীর পুত্রের এ দুর্দিনে তার পাশে না দাঁড়ালে নিমকহারামী হবে। তাই আইয়ুবীর ওখান থেকে পালিয়ে এসেছি। এবার আপনার পরিচয় বলুন। আশা করি আপনার অন্তরঙ্গ হিতৈষী ও জানবাজ রক্ষক হিসাবে আমার মত আর কাউকে পাবেন না। আমরা উভয়ে একই নৌকার যাত্রী। এখন থেকে আপনাদের যে কোন বিপদে আমাকে আপনাদের পাশেই পাবেন।'

'আমি দামেশকের শহরতলীর এক জমিদার। দরবারে আমার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও মর্যাদা ছিল। রাজ্যের প্রশাসন পরিচালনা এবং যুদ্ধ পলিসি নির্ধারণে আমার মতামতের গুরুত্ব অনেক। খলিফার রক্ষী বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যই নিয়োগ দিয়েছি আমি। তিনি আমাকে তাঁর একান্ত আপনজন বলেই ভাবতেন। আমার বেরুতে একটু দেরী না হলে তাঁর সাথে একত্রেই যাওয়ার কথা ছিল আমার।'

'কি সৌভাগ্য আমার! খলিফার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সেবা করার সুযোগ পাচ্ছি আমি! আপনি কি এখন তাঁর কাছেই যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, খলিফা আল মালেকুস সালেহ সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে হলব গিয়ে উঠবেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকেও হলব পৌঁছতে

বলেছেন তিনি।'
'আমিও হলবেই যাচ্ছিলাম। তিনি ঠিকই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। হলবই এখন তাঁর জন্য সবচে নিরাপদ স্থান।'
'তোমাকে পেয়ে আমার খুবই উপকার হলো। জমিদারীর সবকিছু দামেশকে ফেলে এলেও সোনাদানা ও হীরা জহরত যথেষ্টই সঙ্গে নিয়ে এসেছি। বিদেশে মান-সম্মান, প্রতিপত্তি সবই তো কিনতে হবে এ অর্থের বিনিময়ে! আফসোস হচ্ছে আমার চার বিবির জন্য! ওদেরকে চাকর-বাকরের হাতে রেখে এসেছি। কিন্তু লুটপাট শুরু হলে এ চাকররাই আমার বাড়ি লুট করবে না, তার নিশ্চয়তা কি?'
'ও নিয়ে এখন আফসোস করে লাভ নেই। ছোট বিবিকে সঙ্গে আনতে পেরেছেন, এও কি কম কথা!'

o

মাজেদ হেজাযী তার কাহিনী শুনে খুবই খুশী। এ জমিদারের সঙ্গে আমি হলব যেতে পারবো। সেখানে গিয়ে খলিফাকে বলতে পারবো, 'একশ সৈন্যের কমাণ্ডার ছিলাম আমি। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সাথে আমিও দামেশকে প্রবেশ করেছিলাম। কিন্তু আমি মূলত নূরুদ্দিন জঙ্গীর সৈনিক। তাঁর অবর্তমানে তাঁর একমাত্র সন্তান হিসাবে আমার আনুগত্য পাওয়ার হকদার আপনি। এখন আমি নিজেকে আপনার হাতে পেশ করছি। আপনার এ নগন্য গোলামকে এখন আপনি যে কোন কাজে লাগাতে পারেন। আপনি যদি আমাকে আপনার

রক্ষী হিসেবে নিয়োগ দেন তবে তা হবে এ গোলামের বড় পাওনা।'

ওরা আবার হলবের পথে রওনা হলো। সামনে জমিদারের যুবতী স্ত্রী, পেছনে জমিদার ও মাজেদ পাশাপাশি গল্প করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ জমিদার প্রশ্ন করে বসলো, 'আচ্ছা, যদি তুমি রক্ষী হিসেবে আমার কাছে থাকো, তবে তুমি কেমন বেতন দাবী করবে? দামেশকে আমি জমিদার ছিলাম, যেখানে যাচ্ছি সেখানেও রাজার হালেই থাকবো আশা করি, আমার রক্ষী হতে তোমার কোন আপত্তি আছে?'

'যদি আপনি আমাকে আপনার রক্ষী হিসেবে রাখেন তবে আপনার কোন সমর উপদেষ্টার প্রয়োজন হবে না।' মাজেদ হেজাযী বললো, 'আমার কাজের যোগ্যতা দেখে আপনি আমার যা বেতন ধার্য করবেন আশা করি তাতেই আমি সন্তুষ্ট হবো। এ ব্যাপারে আমি এখন এরচে বেশী কিছু বলতে পারবো না।'

জমিদার এ নিয়ে আর চাপাচাপি করলো না। বললো, 'ঠিক আছে, এখন থেকেই তোমাকে আমাদের দেহরক্ষী নিয়োগ করা হলো।'

এভাবেই খলিফার এক দরবারীর সাথে সুলতান আইয়ুবীর এক গোয়েন্দা একাত্ম হয়ে গেল। এ জমিদারের কাছে সীমাহীন ধনরত্ন ছিল। তিনি সেই ধনরত্ন তুচ্ছ ও নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এ আসবাবপত্রের হেফাজতের জন্য তাঁর একজন রক্ষীর প্রয়োজন ছিল। মাজেদকে পেয়ে তার সে অভাব পূরণ হলো।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এল। অস্তমিত লাল সূর্যের রক্তিম আভায় তাদের দেহ-কাঠামোও রঙিন হয়ে উঠল। প্রকৃতিতে ফিরে এল শান্ত সমাহিত এক স্নিগ্ধতার আমেজ।

পাহাড়ের পাদদেশে এক ছায়াস্নিগ্ধ বাগানে এসে ঘোড়ার বাগ টেনে ধরল মাজেদ। বললো, 'এখানে রাত কাটানোই উত্তম হবে।'

জমিদার তাকালো স্ত্রীর দিকে, তার নিরব সম্মতি পেয়ে তিনিও সায় দিলেন এ প্রস্তাবে। সেখানেই রাত কাটালো তারা।

পরদিন ভোর। যখন ঘুম থেকে উঠলো জমিদার ও জমিদার গিন্নি তখন তাদের মাঝে অপরিচিতির আর কোন ব্যবধান রইলো না। মাজেদের ওপর তাদের বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা যেন এক রাতেই পূর্ণতা পেয়ে গেল।

০

দীর্ঘ যাত্রার পর তারা হলবে গিয়ে পৌছলো। সে সময় হলবের আমীর ছিলেন শামসুদ্দিন। কিছুদিন আগে খৃষ্টানদের বশ্যতা স্বীকার করে সন্ধির মাধ্যমে নিজের গদি রক্ষা করে শামসুদ্দিন। খলিফা আল মালেকুস সালেহ দামেশক থেকে পালিয়ে সেখানেই গিয়ে আশ্রয় নিল। তাঁর উজির এবং পরিষদবর্গও আশ্রয় নিল তাঁর সাথে। আরো আশ্রয় নিল তার দেহরক্ষী বাহিনী।

সালেহ হলবের আমীরের সহায়তায় সেখানে নতুন করে সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে শুরু করলো। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে

আনাড়ি লোকদেরকেও সেনাবাহিনীতে ভর্তি করতে বাধ্য হলো কিশোর খলিফা। দামেশক ছেড়ে আসার সময় স্বর্ণ, রৌপ্য ও প্রচুর পরিমাণ অর্থ-সম্পদ সঙ্গে এনেছেন তিনি। অর্থের কোন অভাব নেই, অভাব শুধু সৈন্য ও কমাণ্ডারের। তিনি ও তার পরিষদবর্গ খেলাফত পুনরুদ্ধারের জন্য সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

তাদের কার্যকলাপে পরিষ্কার প্রকাশ পাচ্ছিল, তাদের শত্রু খৃস্টানরা নয়, তাদের শত্রু হচ্ছে সুলতান আইয়ুবী।

তারা খলিফার সীলমোহরযুক্ত চিঠি নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে ছুটাছুটি করতে লাগলো। সেইসব চিঠির বক্তব্য একটাই, তারা যেন খলিফা আল মালেকুস সালেহকে সামরিক সাহায্য দিয়ে সহযোগিতা করে।

হেমস্, হেসাত ও মুসালের শাসনকর্তার কাছেও গেল খলিফার বিশেষ দূত। এসব রাজ্যের আমীরদের কারো দিক থেকে আশাপ্রদ উত্তর পাওয়া গেল, কারো কাছ থেকে শুধু পাওয়া গেল সহযোগিতার মৌখিক সমর্থন।

এই জমিদার যখন হলবে এসে পৌঁছলো তখন খলিফা তাঁকে খোশ আমদেদ জানালেন। খলিফা সালেহের তিনি অন্যতম যুদ্ধ উপদেষ্টা ছিলেন। তাকে পেয়ে খলিফার উদ্যম আরো বেড়ে গেল। হলবে তাঁকে একটি পরিপূর্ণ বাড়ি দেয়া হলো বসবাসের জন্য।

এখানে আসার সাথে সাথে তিনি এমন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে, সকালে খলিফার সাথে বের হয়ে যান, আর মধ্যরাতে বাসায় ফিরেন।

এদিকে তার নিঃসঙ্গ যুবতী স্ত্রী একাকী থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে

উঠল। এই একাকীত্ব কাটাতে গিয়ে মাজেদ হেজাযীর সঙ্গে বেশ হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠল তার।
মাজেদ হেজাযীর ব্যক্তিত্বপূর্ণ আচরণ এবং মনিব পত্নীর প্রতি আন্তরিক সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মধ্যে এক আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষ্য করে বিস্মিত হয় জমিদার পত্নী। বডিগার্ড হিসাবেই সে কেবল বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নয়, পারিবারিক যে কোন কাজেই তার ওপর আস্থা স্থাপন করা যায়।
মাজেদের চমৎকার আচরণ, যাদুর পরশ ছোঁয়া কণ্ঠস্বর, আন্তরিক ব্যবহার, বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় সহানুভূতিপূর্ণ আর্দ্র হৃদয় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই যুবতীর হৃদয়-মন জয় করে নিল।
মাজেদ তার মিশন সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ। সে মুহূর্তের জন্যও তার দায়িত্বের কথা বিস্মৃত হলো না। সঠিকভাবেই তার মিশনের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলো।
মেয়েটি তার নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য বেছে নিল মাজেদকে। চোখের আড়ালে গেলেই সে মাজেদকে ডেকে নেয় তার কাছে। তার সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে দেয় সময়।
গল্পচ্ছলেই একদিন মাজেদ তাকে জিজ্ঞেস করলো মনিবের অন্য চারজন স্ত্রীর কথা।
মেয়েটি বললো, 'তুমি তাদের সম্পর্কে কি জানতে চাও? দেখতে শুনতে তারা কেউ অসুন্দরী নয়। বংশ, মর্যাদা, ব্যবহার সবই ভাল। স্বামী তাদের অপছন্দ করেছে পুরনো বলে। বয়স কম বলেই আমি স্বামীর প্রিয়ভাজন হতে পেরেছি।'
'কিন্তু পালাবার সময় কেউ নিজের স্ত্রীদের ফেলে আসে?'
'আমার মত যুবতী সঙ্গে থাকলে তার যে আর অন্য কারো দরকার নেই! কেন বেহুদা ওদের নিয়ে টানাটানি করবেন

তিনি?'
'নিজের প্রয়োজনটাই সব! তার মানে এমনিভাবে কোন একদিন তোমাকেও ত্যাগ করে তিনি অন্য কাউকে নিয়ে আসবেন?'
'ধনীদের চরিত্রই এরকম। হাতে যখন টাকা থাকে, বাজারের সেরা জিনিসটিই সব সময় হাতের কাছে রাখতে চায় তারা। আমাদের মত মেয়েদের সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যে তাদের কি এসে যায়!'
'তুমি এমনভাবে কথা বলছো, যেনো স্বামীকে ঘৃণা করো?'
'করিই তো! যদি আমি তোমাকে আমার মনের কথা বলি, তবে তুমি কি ভাববে জানি না। কিন্তু আমার বলতে খুব ইচ্ছে করছে।'
'তাহলে বলো! তোমাকে কে নিষেধ করেছে?'
'কিন্তু তুমি তা স্বামীর কাছে বলে দিবে না তো?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো, 'আমাকে বিপদে ফেলবে না তো?'
'আমার স্বভাবে যদি কোন প্রবঞ্চনা ও ধোঁকা থাকতো তবে পথেই তোমার স্বামীকে হত্যা করে তোমাদের ধনরত্ন এবং তোমাকে আমি সহজেই ছিনিয়ে নিতে পারতাম।' মাজেদ হেজাযী বললো, 'আমি যুবক, কিন্তু আল্লাহকে ভয় করি। কোন নারীকে বিপদে ফেলা সত্যিকার মুসলমানের স্বভাব নয়!'
'মাজেদ! আমাকে ক্ষমা করো। আমি আর আমার মনের কথা বেশীক্ষণ গোপন রাখতে পারছি না। তুমি বিশ্বাস করো আর না-ই করো, তবু আমি বলবো, তোমাকে আমি ভালবাসি।' মেয়েটি বললো, 'আর এটাও জেনে রেখো, কোনদিন আমি আমার স্বামীকে ভালবাসিনি, তাকে আমি ঘৃণা করি।'

'এ তুমি কি বলছো! একজন বিবাহিত নারী হয়ে পরপুরুষকে ভালবাসা অন্যায়!' প্রতিবাদ করে উঠল মাজেদ।

'হ্যাঁ অন্যায়। কিন্তু আমার কাহিনী তুমি জানো না, জানলে এভাবে বলতে পারতে না তুমি। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার কাছে আমাকে বিয়ে দেয়া হয়েছে। বলতে পারো, আমি তার কাছে বিক্রি হওয়া মেয়ে। কতবার আমি আত্মহত্যার কথা চিন্তা করেছি। কিন্তু আমি বড় ভীতু মেয়ে! আত্মহত্যা করার সাহসটুকুও আমি সঞ্চয় করতে পারিনি।' কান্না কাতর কণ্ঠ মেয়েটির।

'তোমার স্বামী একজন প্রতিষ্ঠিত লোক। অর্থ-বিত্ত, মান-সম্মান, পৌরুষ কোনটারই তার অভাব নেই। তুমি তাকে ঘৃণা করতে যাবে কেন?'

'আমাদের চিন্তা-চেতনা ও আদর্শ ভিন্ন। মরহুম জঙ্গীর স্ত্রী আমার মনে ইসলামের যে আলো জ্বেলে দিয়েছেন, ইসলামের যে শিক্ষায় আমাকে শিক্ষিত করে তুলেছেন, সে শিক্ষার প্রতি আমার স্বামীর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। যে লোক আল্লাহর বান্দা হয়ে আল্লাহকেই ভালবাসেনা, যে আল্লাহ তাকে এত সম্মান ও নেয়ামত দিয়েছে তার শোকর আদায় করে না, সে তো মানুষ নামের অযোগ্য।

আমার স্বামী যা করে বেড়ায় তার সবই সভ্যতা ও মানবতার জন্য অকল্যাণকর। এমন লোককে ঘৃণা ছাড়া আমি আর কিইবা দিতে পারি! এ লোক আমার জীবনটা ব্যর্থ করে দিয়েছে। মরণ ছাড়া তাইতো এখন আমার আর চাওয়ার কিছু নেই।'

'কিন্তু এই না বললে, আমাকে তুমি ভালবাসো! আমাকে

ভালবাসো বলেই কি তুমি এখন মরতে চাচ্ছো?'
'না, সে কারণে নয়!' মেয়েটি বললো, 'মরতে চাচ্ছি আমার বিশ্বাসের মৃত্যু হয়েছে বলে।
আমার মনে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী সম্পর্কে খুবই উচ্চ ধারণা ছিল। নূরুদ্দিন জঙ্গীর চেয়েও তার কাছে আমার প্রত্যাশা ছিল বেশী। তুমি আমার সে ধারণা ও বিশ্বাসকে ভেঙ্গেচুরে একাকার করে দিয়েছো। সত্যি কি সালাহউদ্দিন এতই খারাপ, যেমন তুমি বলেছো?'
'সালেহা!' মাজেদ হেজাযী বললো, 'তোমার গোপনীয়তা তুমি আমার কাছে প্রকাশ করে দিয়েছো। বিনিময়ে আমিও তোমাকে কিছু গোপন কথা বলতে চাই। আমি তোমার কাছ থেকে এর জন্য কোন ওয়াদা নিতে চাই না, কিন্তু এটুকু বলতে চাই, যদি আমার গোপন কথা ফাঁস হয়ে যায়, তবে তুমিও বাঁচবে না, তোমার স্বামীও বাঁচবে না।'
'ভয় নেই, তুমি নিঃসঙ্কোচে তোমার মনের কথা বলতে পারো। আমার ভালবাসাই তোমার গোপন কথার জামিনদার।' বললো সালেহা।
'আমি সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সামান্য এক গোয়েন্দা! আমি তোমাকে এতটুকু বলতে পারি, সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী সম্বন্ধে তোমার যে ধারণা, তার চেয়েও তিনি অনেক অনেক পবিত্র ও মহান।
তিনি সেই আমীর ও বাদশাহদের শত্রু, যারা যুবতী মেয়েদেরকে তাদের অন্দর মহলে বন্দী করে রেখেছে। পুরুষ নারীদেরকে শুধু আমোদ-স্ফূর্তির উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করবে, তিনি এই প্রথার ঘোর বিরোধী। তিনি নারী ও পুরুষের

সমতা বিধানের এবং শরীয়ত সম্মত জীবন যাপনের বিধানে বিশ্বাসী। এ জন্যই তিনি মেয়েদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ পর্যন্ত প্রদানের পক্ষে।

আমি তোমার স্বামীর বিশ্বাস ও আস্থা অর্জনের জন্য মিথ্যা কথা বলেছিলাম। আইয়ুবীর সেনাবাহিনী দামেশক থেকে পলাতক লোকদের ওপর লুটতরাজ করছে এবং তাদের মেয়েদের ধরে আনার জন্য সৈন্য পাঠিয়েছে, এ তথ্য ডাহা মিথ্যা। তিনি ইসলামের পতাকাবাহী কাফেলার নেতা। ইসলামী কাফেলা কখনো অন্যায় করে না, এবং অন্যায় বরদাশতও করে না। আমি সে ইসলামেরই এক নগন্য খাদেম। ইসলামের স্বার্থেই সুলতান আইয়ুবীর পক্ষ থেকে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য এসেছি আমি।'

মেয়েটির চোখে মুখে আনন্দের বিদ্যুৎ বয়ে গেল। সে মাজেদ হেজাযীর একটি হাত চেপে ধরে বললো, 'তোমার এ গোপন কথা কোনদিন ফাঁস হবে না। তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না। তুমি এখানে কেন এসেছ আমি বুঝে গেছি। তোমাকে আমি কি সাহায্য করতে পারি শুধু তাই বলো!'

'উতলা হয়ো না। তোমাকে কিছু করতে হবে না, যা করার আমিই করছি।'

'ভয় পেয়ো না। আমাকে অবলা নারী ভেবো না। আমি সেই দলের মহিলা, যাদেরকে নূরুদ্দিন জঙ্গীর স্ত্রী ট্রেনিং দিয়েছিল যুদ্ধ করার জন্য। জঙ্গী বেঁচে থাকতেই আমরা খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ট্রেনিং পেয়েছিলাম।'

মুহূর্ত খানিক থামলো সালেহা। তারপর আবার বলতে শুরু করলো, 'আমার বাবা এসব পছন্দ করতেন না। তিনি খুব

লোভী লোক ছিলেন। তার কাছে ক্রুশ ও হেলালে কোন পার্থক্য ছিল না। তিনি ছিলেন টাকার গোলাম। টাকা পেয়ে তিনি আমাকে এই লোকের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। আমি জানি, এই কেনা বেচাকে সমাজ বিবাহ বললেও ইসলাম একে বিবাহ বলে না। ইসলামে নারীর পছন্দ ও সম্মতি ছাড়া বিয়ে হয় না।'

'ইসলাম মেয়েদের সম্মান, মর্যাদা এবং অধিকার দেয় বলেই অতীতে মহীয়সী মহিলারা যুদ্ধের ময়দানে জেহাদের ঝাণ্ডা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস দেখিয়েছে। জাতীয় বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজেই মেয়েরা পুরুষদেরকে তাক লাগিয়ে দিতে পারে, এমনকি যুদ্ধে শত্রুদের গতি স্তব্ধ করে দিতে পারে।' সালেহার কথার রেশ ধরে বললো মাজেদ।

'তুমি ঠিকই বলেছো। সেই মেয়েদেরকেই যদি অন্দর মহলে বন্দী রাখা হয়, তখন সে বিড়াল হয়ে যায়। যেমন হয়েছে আমার অবস্থা।' বললো সালেহা, 'যদি আমার স্বামী সাধারণ কোন লোক হতো তবে অনেক আগেই আমি বিদ্রোহ করতাম। তার থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করতাম। কিন্তু এ লোকের কাছে অর্থ আছে, শক্তি আছে। খলিফার তিনি সামরিক উপদেষ্টা। খলিফার রক্ষীবাহিনীর অধিকাংশ সদস্যই তাঁর নিজস্ব। তাদের তিনিই রক্ষী বাহিনীতে ভর্তি করিয়েছেন। আমি তার ছোট বিবি। যুবতী ও সুন্দরী বলেই আমি তার খেলনার পাত্রী ও সামগ্রী। ইচ্ছে থাকলেও তার এই বিপুল শক্তির বিরুদ্ধে আমি রুখে দাঁড়াতে পারিনি।

কিন্তু তার কাছে এসে আমার আত্মা মরে গেছে। বেঁচে আছে শুধু দেহটা। বাইরের দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে

গেছে। এখন আমি যে দুনিয়াতে বন্দী আছি, সেখানে শুধু শরাব, নাচ ও গানের মাতামাতি। আর আছে আইয়ুবীকে হত্যা করার বিরামহীন চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র!'

কথা বলতে বলতে হঠাৎ সে চুপ হয়ে গেল সালেহা। মাজেদ হেজাযীকে ধাক্কা দিয়ে বললো, 'তুমি কি আমার কথা শুনছো? তুমি সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর গোয়েন্দা হও বা আমার স্বামীর গোয়েন্দাই হও, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তুমি যদি আমার স্বামীর গোয়েন্দা হও তবে তাঁকে সব কথা ঠিকঠাক মত বলে দিও। তিনি আমাকে যেমন খুশী শাস্তি দিক, আমি তার পরোয়া করি না। এখন আমি যে কোন শাস্তি সহ্য করার জন্য প্রস্তুত। আত্মা তো আমার আগেই মরে গেছে, এ পোড়া দেহ আর কতটুকুই বা কষ্ট পাবে!'

'না, তোমার আত্মা মারা যায়নি।' মাজেদ হেজাযী বললো, 'আমার দৃষ্টি তোমার আত্মার গভীর তলদেশ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, সেখানে এক মুজাহিদের সতেজ আত্মা তোলপাড় করছে। এখন নয়, আরো আগেই আমি সে আত্মার সন্ধান পেয়েছিলাম। সেই ভরসাতেই আমি তোমার কাছে আমার গোপন কথা ব্যক্ত করেছি।

আমি রূপ, যৌবন ও সৌন্দর্য দেখে বশীভূত হওয়ার মত লোক নই। ইসলামের সৌন্দর্য দেখার পর আর কোন সৌন্দর্য দেখার প্রয়োজন নেই আমার। ইসলামের জন্য এ জীবন আমি উৎসর্গ করে দিয়েছি।

তোমার মনে আগ্নেয়গিরির যে লাভা টগবগ করে ফুটছে তা বের হয়ে আসতে দাও। তোমার যত কথা আছে সব খুলে বলো আমাকে। মনটা হালকা করো। আমি মনোযোগ দিয়েই

তোমার কথা শুনছি।'
'না মাজেদ, আমার মনের কষ্ট প্রকাশ করে তোমার আত্মাকে কষ্ট দিতে চাই না। আমার দুঃখের কাহিনী আমার বুকেই কবর হয়ে যাক।'
'কিন্তু সালেহা! তোমার এ কাহিনী নতুন কিছু নয়। এটাই যে আজ প্রত্যেক মুসলমান নারীর জীবন-কথা, মর্মব্যথা। যে দিন থেকে ইসলামের অধ:পতন শুরু হয়েছে, সে দিন থেকেই মুসলমানদের অন্দর মহলগুলো এ চাপা কান্নায় ভরে উঠেছে। সুন্দরী মেয়েদের কিনে এনে বন্দী করার বর্বরতা ইসলাম কোন মানুষকে শিখায়নি।'
'অধ:পতনের এখানেই শেষ নয়। তুমি শুনলে অবাক হবে, খৃস্টান যুবতীদের দিয়ে এখন আমীর ও বিত্তবানদের হেরেমগুলো ভরে উঠেছে।'
'জানি, আমরা এ সবই জানি। আমীরদের মহলগুলো খৃস্টান যুবতী ও সুন্দরীদের দিয়ে ভরে উঠার পরও তারা কেবল মুসলমানই থাকছে না, এই অসভ্যতার পরও তারা মুসলমানদের নেতা বনে যাচ্ছে!'
'আমার স্বামীর মহলেও তাই হয়েছে।' মেয়েটি বললো, 'আমার চোখের সামনেই খৃস্টান মেয়েরা আমার স্বামীকে নিয়ে আড্ডা মারে, তাকে শারাব পান করায়। তখন কান্না ছাড়া আমার আর কিছুই করার থাকে না।'
'কিন্তু এতে যে আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাচ্ছে, স্বামী-স্ত্রীতে ফাটল ধরছে, এই বোধটুকুও নেই আমাদের আমীরদের।'
'না, ওই মেয়েরা আমার স্বামীকে আমার কাছ থেকে দূরে

সরিয়েছে, এ জন্য আমি মোটেও দুঃখিত নই, আমার একমাত্র আফসোস ও দুঃখ হচ্ছে, তারা তাকে ইসলাম থেকেও দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অথচ ইসলামের জন্যই আমাদের জীবন-মরণ। কেবল তাঁরই এবাদত করার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন।'

মাজেদ হেজাযী তাকে আর এগুতে দিল না। বললো, 'এখন ওসব আবেগের কথা রাখো। যে কাজের জন্য আমি এখানে এসেছি সেই কাজের কথা শোন।'

মাজেদ হেজাযী তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার স্বামীর ওপর তোমার প্রভাব কেমন? সে কি তোমাকে বিশ্বাস করে? তার কাছ থেকে তার মনের গোপন কথা কি তুমি বের করে আনতে পারবে?'

মেয়েটির মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি খেলে গেল। বললো, 'তা না পারার কি আছে! দুই পিয়ালা শরাব আর একটু আদর দিয়ে মনের গভীর গহীন থেকে এমন কোন কথা নেই যা বের করে আনা সম্ভব নয়।' মেয়েটি বললো, 'তুমি কি তথ্য জানতে চাও?'

সে একটু চিন্তা করে হেসে বললো, 'তুমি আমার ব্যক্তিগত একটি শর্ত মেনে নেবে? আমি যদি তোমার কাজ করে দেই তবে কি তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে? এই বন্দীশালা থেকে মুক্তি দেবে আমাকে?'

মাজেদ হেজাযী তার শর্ত মেনে নিলো। বললো, 'খলিফা আস সালেহ মাত্র এগারো বছরের বালক। তিনি আমীরদের হাতের খেলনামাত্র। এসব আমীর ও উজিররা সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করে ইসলামী সাম্রাজ্যকে খণ্ড বিখণ্ড করে একেকজন

সেই ক্ষুদ্র অংশের শাসক হতে চায়। খৃস্টানরাও তাই চায়। ইসলামী সালতানাত খণ্ড-বিখণ্ড হলে তা গ্রাস করা সহজ হয়ে যাবে ওদের পক্ষে। সহজেই তারা ইসলামের নাম নিশানা মুছে দিতে পারবে।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী বলেন, 'যে জাতি তার রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে, সে জাতি কোনদিন বেঁচে থাকতে পারে না।' আমাদের এ সকল আমীররা খৃস্টানদের কাছ থেকে সাহায্য নিচ্ছে। খৃস্টানরাও নিজেদের স্বার্থেই তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে।

আমি এ কথা জানার জন্যই এখানে এসেছি, খলিফার দরবারে কি পরিকল্পনা হচ্ছে, খৃস্টানরা তাঁকে কিভাবে এবং কতটুকু সাহায্য দিচ্ছে। জাতীয় স্বার্থে এ সংবাদ জানা খুবই জরুরী। আমাকে অতিসত্তর এ সংবাদ সুলতান আইয়ুবীর কাছে পৌঁছাতে হবে, যাতে তিনি সেই মোতাবেক প্রস্তুতি নিতে পারেন। নইলে এমনও হতে পারে, সুলতান আইয়ুবী খৃস্টানদের আক্রমণের মুখে পড়ে যেতে পারেন।'

'সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী কি মুসলমান আমীদের উপরও আক্রমণ চালাবেন?' মেয়েটি প্রশ্ন করলো।

'যদি প্রয়োজন হয় তিনি তাতে দ্বিধাবোধ করবেন না!'

এই জবাব শুনে মেয়েটির চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। সে আবেগতাড়িত কণ্ঠে বললো, 'হায়! সেই দিনগুলোও আমাদের দেখতে হলো, একই রাসূলের উম্মতরা আজ শত্রুদের রেখে নিজেদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিচ্ছে হাতে!'

'এ ছাড়া যে আর কোন গতি নেই আমাদের!' মাজেদ হেজাযী বললো, 'সালাহউদ্দিন আইয়ুবী তো বাদশাহ নন, তিনি আল্লাহর

সৈনিক। তিনি বলেন, 'দেশ ও জাতিকে ভয় ও আশংকা থেকে মুক্ত রাখার দায়িত্ব আল্লাহ সৈনিকদের ওপরই ন্যস্ত করেছেন।' তিনি আরও বলেন, 'সেনাবাহিনী সরকারের হাতের খেলার পুতুল হতে পারে না। তাদের দায়িত্ব জাতির মান-সম্মান ও আজাদী রক্ষা করা। আর তা করতে গিয়ে যদি গাদ্দার এবং ক্ষমতালোভীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হয়, তাহলে আমাদের তাও ধরতে হবে।'

'উনি ঠিকই বলেছেন। গায়ের ফোঁড়া না কাটলে তাতে পচন ধরে। সেই পচন কখনো কখনো মৃত্যুরও কারণ হতে পারে। জাতির ভাগ্য বিক্রি করে যারা নিজেদের ভাগ্য গড়তে চায় তারা সমাজদেহের বিষাক্ত ফোঁড়া, এই ফোঁড়া যত তাড়াতাড়ি সরানো যায় ততই মঙ্গল। এখন বলো, এ ক্ষেত্রে আমি তোমাকে কি সাহায্য করতে পারি?'

'সামরিক বাহিনী সরকারের শক্তির অন্যতম উৎস। এখন তোমার কাজ হলো, স্বামীর কাছ থেকে তাদের পরিকল্পনা এবং গোপন তথ্য সব জেনে নেয়া।'

'আমি গোপন তথ্যও দেবো আন্তরিক দোয়া এবং শুভেচ্ছাও জানাব। কিন্তু আমারও একটি দাবী আছে, যখন তুমি এখান থেকে দামেশকে রওনা হবে, তখন তোমার সঙ্গে গোপন তথ্যের সাথে তার সরবরাহকারীকেও রাখতে হবে। এ শর্তের কথা কিন্তু ভুলে যেয়ো না।' বললো মেয়েটি।

০

ত্রিপোলীর খৃস্টান রাজা রিমাণ্ডের কাছ থেকে খলিফা আল

মালেকুস সালেহের পাঠানো দূত যেদিন ফিরে এলো তার পরের দিন।

মেয়েটি মাজেদ হেজাযীকে বললো, 'আজ রাতে আমি আমার স্বামীর কাছ থেকে অনেক গোপন তথ্য আদায় করেছি। সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের জাল তৈরী করছে তারা। আমি যখন তাকে বললাম, 'তোমরা আসলে কাপুরুষ। নইলে এত বড় রাজ্যের খলিফা, এত যার সৈন্য-সামন্ত, সামান্য কয়েক হাজার সৈন্যের ভয়ে রাজধানী ছেড়ে পালায়! তোমরা কাপুরুষের মত দামেশক থেকে পালিয়ে হলবে এসে আশ্রয় নিয়েছো, আর এমন ভাব দেখাচ্ছো, যেন প্রতি মুহূর্ত যুদ্ধের ময়দানে কাটাচ্ছো। এত যারা ভীতু তাদের 'রাজ্য রাজ্য' খেলার কাজ কি? আমার মত নারীর আঁচলেই তোমাদের শোভা পায়।'

স্বামী বললো, 'দেখো, ঠাট্টা করবে না বলে দিচ্ছি। আইয়ুবীর সামনে তো পড়োনি, পড়লে বুঝতে!'

'ওরে আমার বীর পুরুষ! এক আইয়ুবীর ভয়েই কম্ম সারা! যেই খলিফার সামরিক উপদেষ্টার এত সাহস, সেই খলিফার ভাগ্যে যে কি আছে আল্লা মালুম!'

আমার এ কথায় ভয়ানক ক্ষেপে উঠলেন তিনি। গজর গজর করতে করতে বললেন, 'বেকায়দায় পড়লে নাকি চামচিকাও হাতির গায়ে লাথি মারে। বলো, আর কয়দিন বলবে! আরে, আইয়ুবী তো কয়েক দিনের মেহমান মাত্র! ফেদাইন গ্রুপের খুনী পীর মান্নানকে দায়িত্ব দিয়েছি। শীঘ্রই সুলতান আইয়ুবীর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মান্নানকে তো চেন না! এ কাজে তার মত দক্ষ ব্যক্তি এ তল্লাটে আর নেই।'

'সেনাবাহিনী রেখে এখন একজনমাত্র খুনীর ওপর ভরসা করছো!'

'আরে না না! আমাদের সেনাবাহিনী গঠনের কাজ পুরোদমেই চলছে। শীতকাল এসে গেছে প্রায়। পাহাড়ী এলাকায় বরফ পড়াও শুরু হয়ে গেছে। পুরোমাত্রায় বরফ যখন পড়বে, তখনই আমরা চড়াও হবো আইয়ুবীর ওপর। সুলতান আইয়ুবী ও তার সৈন্যরা মরুভূমিতে যত সচ্ছন্দে লড়াই করতে পারে পাহাড়ী এলাকায় এত শীত ও বরফের মধ্যে ততটা দক্ষতা দেখাতে পারবে না।'

এভাবেই শুরু।

নারী ও মদের নেশা একজন পুরুষের বুক থেকে সকল গোপন তথ্য বের করে নিতে পারে। মেয়েটি প্রতি রাতে তার স্বামীর কাছ থেকে সারাদিনের খবরা-খবর জেনে নিতে থাকে, আর পরদিন সকালে এসব গোপন তথ্য মাজেদ হেজাযী তার মনের খাতায় লিপিবদ্ধ করতে থাকে।

কিন্তু এ ব্যবস্থায় বাঁধা এলো হঠাৎ করেই। একদিন তার স্বামী মাজেদ হেজাযীকে ডেকে বললো, 'তোমার সম্পর্কে আমার কানে কিছু আপত্তিকর অভিযোগ এসেছে। তুমি নাকি আমার অনুপস্থিতিতে বেশীরভাগ সময় আমার বেগমের কাছে বসে থাকো এবং তোমাদের মেলামেশা আপত্তিকর পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে।'

মাজেদ কেঁপে উঠলো। ভাবলো, হয়ত সব গোপন ফাঁস হয়ে গেছে! সে মাথা নিচু করে মালিকের সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

মেয়েটির স্বামী আবার বললো, 'আমি জানি, আমার তুলনায়

তুমি সুন্দর ও বয়সে যুবক। আমার স্ত্রী তোমাকে পছন্দ করে ফেলতে পারে। এমনও হতে পারে, তুমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারো। কিন্তু আমি সে সুযোগ তোমাকে দেবো না। যদি অভিযোগ সত্যি হয় এবং তুমি আমার স্ত্রীর দিকে নজর দিয়ে থাকো, তাহলে তোমাকে আমি খুন করে ফেলবো।'

মাজেদ হেজাযী তাকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করলো। বললো, 'এটা আপনার ভুল ধারণা। উনি আমার মালকিন! উনার দিকে আমি কুনজর দিতে যাবো কোন্ সাহসে!'

মাজেদ হেজাযীর কণ্ঠে যাদু ছিল। মালিক চরম ব্যবস্থা নিতে গিয়েও আর নিলেন না। বললেন, 'ঠিক আছে, আমি তদন্ত করে দেখছি। মুখ দেখে তোমাকে যতটা নিস্পাপ মনে হয়, বাস্তবে তার সত্যতা কতটুকু আমাকে খতিয়ে দেখতে হবে।'

মাজেদ হেজাযী এখান থেকে সরে যেতে চাচ্ছিল না। এখনও খলিফা সালেহের পূর্ণ পরিকল্পনা জানা হয়নি তার। তাই সে মনিবের দাপট ও ধমক নিরবে সহ্য করে নিল। অনুনয় বিনয় করে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। বললো, 'আমি কোন অপরাধ করিনি, তবু যখন আপনার মনে সন্দেহ জেগেছে, এখন থেকে আমি আরো সতর্ক থাকবো। কোন রকম অভিযোগ করার সুযোগ দেবো না কাউকে।'

মাজেদ যতই তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করুক, কারো মনে একবার সন্দেহ দানা বেঁধে উঠলে তা দূর করা কঠিন।

জমিদার মাজেদ হেজাযীকে সাবধান করার সাথে সাথে তার স্ত্রীর ওপরও কড়া নিষেধাজ্ঞা জারী করলো, 'মাজেদ হেজাযীর সাথে কখনো মেলামেশা করবে না।'

এতেও সে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারলো না, সেদিনই সে আরো কয়েকজন নতুন বডিগার্ড নিয়োগ করলো।

সে যুগে আমীর ও ধনী লোকদের সম্মান নির্ধারণ করা হতো বডিগার্ডের বহর দেখে।

জমিদারের বডিগার্ড সংখ্যা মাজেদ হেজাযীসহ এখন সাতজন। জমিদার তাদের মধ্য থেকে একজনকে কমাণ্ডার বানিয়ে দিল। কমাণ্ডার মাজেদ হেজাযীকে নির্দেশ দিয়ে বললো, 'যেহেতু মালিক তোমার ওপর খুশী নয়, সে জন্য মালিকের দরজার কাছেও যাওয়া উচিত নয় তোমার। আর রাতে এক মুহূর্তের জন্যও অনুপস্থিত থাকতে পারবে না।'

মাজেদ বিনয়ের সাথে তার এ আদেশও মেনে নিল।

এরপর ঘটনাহীনভাবেই কেটে গেল দু'তিন রাত। একদিন দুপুর রাতে মেয়েটি বাড়ির বাইরে এলো। বাইরের গেটে এক গার্ড ছিল পাহারায়। মালিকের স্ত্রীকে দেখেই সে সালাম করে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে রইল।

মেয়েটি কর্তৃত্বের সুরে বললো, 'তুমি কি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে, নাকি বাড়ির চারদিকে পায়চারী করবে?'

সে কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে যাবে, মেয়েটি আবার বললো, 'তুমি নতুন এসেছ, তাই না? নিয়ম কানুন এখনো সব রপ্ত করতে পারোনি। এদিক থেকে দামেশকের প্রহরী খুব হুঁশিয়ার ও সতর্ক ছিল! চাকরী করতে হলে তোমাকেও হুঁশিয়ার ও সতর্ক হতে হবে। তোমাদের মালিক খুব কড়া মেজাজের মানুষ। ডেউটিতে কোনরকম গাফলতি দেখলে চাকরী থাকবে না কারো।'

প্রহরী সসম্মানে মাতা নত করে দাঁড়িয়ে রইলো।

মেয়েটি বডিগার্ডরা যেখানে থাকে সেদিকে এগিয়ে গেল। গেটের পাহারাদার দৌড়ে গিয়ে কমাণ্ডারকে জানালো, 'মালকিন আমাদের পাহারা তদন্ত করতে এসেছেন!'

কমাণ্ডার হতভম্বের মত উঠে ছুটে এসে তার সামনে মাথা নত করে দাঁড়ালো। মেয়েটি তাকেও কড়া ধমক লাগালো, 'বাড়ির চারদিকে ডিউটির এ অব্যবস্থা কেন?'

কমাণ্ডার ডিউটি তদারক করতে চলে গেল।

মেয়েটি অন্য একটি কামরার সামনে এসে দাঁড়ালো এবং জোরে জোরে কথা বলতে লাগলো। মাজেদ হেজাযী এ কামরাতেই শুয়ে ছিল। মেয়েটির হাক ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল তার। সে ছুটে বাইরে এলো।

মেয়েটি তার সঙ্গেও কড়া মেজাজে কথা বললো, 'পাহারাদারদের এত ঘুমালে চলবে কি করে?'

ততক্ষণে কমাণ্ডার ডিউটি তদারক শেষে আবার ফিরে এসেছে সেখানে। মেয়েটি কমাণ্ডারকে সামনে পেয়েই আদেশ করলো, 'আমার এখুনি খলিফার মহলে যেতে হবে। জলদি দুটো ঘোড়া ও একজন পাহারাদারকে সঙ্গে দাও।' তারপর বিরতি না দিয়েই মাজেদের দিকে ফিরে বললো, 'তোমার এখন ডিউটি নেই, তাই না? ঠিক আছে তুমিই চলো।'

'যদি মালিক আপনার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করেন তবে কি বলবো?' কমাণ্ডার তাকে প্রশ্ন করলো।

'আমি কোন প্রমোদ ভ্রমণে যাচ্ছি না।' মেয়েটি আরও ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো, 'মালিকের কাজেই যাচ্ছি! যাও, জলদি ঘোড়া রেডি করো।'

কমাণ্ডার এক প্রহরীকে আস্তাবলে পাঠিয়ে দিল। মাজেদ হেজাযী দ্রুত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নিল। মেয়েটি তাকে নিয়ে আস্তাবলের দিকে রওনা দিল।

কমাণ্ডারকে তার মালিক বলে রেখেছিল, 'মাজেদ হেজাযীর ওপর কড়া দৃষ্টি রাখবে, যেন সে মহলের ভেতর যেতে না পারে।' এখন মালকিন নিজেই মাজেদকে বেছে নিলেন। এ অবস্থায় কমাণ্ডার কি করবে ভেবে পেল না। সে হতভম্বের মত তাকিয়ে দেখলো, তারা দু'জনেই আস্তাবলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সে একবার ওদের বাঁধা দেয়ার কথা চিন্তা করলো, কিন্তু পরক্ষণেই তা বাতিল করে দিল এই ভেবে, 'মালিকের স্ত্রীও মালিক। তার কোন কাজে বাঁধা দেয়ার এখতিয়ার আমার নেই।'

তখনি তার মনে হলো, এ সংবাদ এখনি মালিককে দেয়া দরকার। তিনি যা নির্দেশ দেবেন সেভাবে এগুনোই ভাল।

সে ভয়ে ভয়ে গেট পেরিয়ে মহলের ভেতরে গেল এবং মালিকের কামরার দরজায় নক করলো। ভেতর থেকে কোন সাড়া না পাওয়ায় সে আবারো নক করে দরজা খোলার অপেক্ষা করতে লাগলো। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও ভেতর থেকে কোন সাড়া না পাওয়ায় সে আস্তে করে দরজায় ধাক্কা দিলো। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। ভেতরে পা রাখল কমাণ্ডার।

ভেতরে প্রদীপ জ্বলছিল। কামরা ভরা শরাবের গন্ধ। সে তার মালিকের দিকে তাকালো। বিছানায় পড়ে আছেন তিনি। মাথা ও একটি হাত পালংকের পাশে ঝুলছে। একটি খঞ্জর বিদ্ধ হয়ে

আছে তার বুকে। খঞ্জরটি যেখানে বিঁধে আছে তার আশে পাশে আরো কয়েকটি আঘাতের চিহ্ন জ্বল জ্বল করছে।
কমাণ্ডার হাত ধরে তার পাল্‌সের গতি দেখলো। সব শেষ, জীবনের কোন স্পন্দন নেই সেখানে। তার কাপড় চোপড়, বিছানা রক্তে ভেজা। কমাণ্ডার বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে সে রক্তের দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রতিদিনের মত সেদিনও মেয়েটি স্বামীকে শরাব পান করাচ্ছিল আর তার কাছ থেকে কিভাবে কথা আদায় করা যায় ভাবছিল। অন্যান্য দিনের তুলনায় স্বামীর চেহারায় সে খুশীর আভা দেখতে পেল। এটা নিয়েই কথা শুরু করলো সে, 'কি ব্যাপার! খুব খুশী খুশী মনে হচ্ছে আজ তোমাকে?'
'আরে খুশী হবো না, ফেদাইন গ্রুপের গুপ্তঘাতক আজই রওনা হবে আইয়ুবীর উদ্দেশ্যে। আইয়ুবীর হাত থেকে নিস্তার পাওয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।'
খবরটা শোনার সাথে সাথে শিহরণ খেলে গেল তার দেহে। আইয়ুবীকে হত্যা করার জন্য আজই রওনা হবে গুপ্তঘাতক! এ খবর এখুনি মাজেদকে জানানো দরকার! দেরী হলে যে কোন মুহূর্তে অঘটন ঘটে যেতে পারে!
সে তার স্বামীকে প্রতিদিনের মত শরাব পান করালো। আজ সে এত বেশী খেয়েছে যে, বেহুশ হয়ে গেল। মেয়েটি তাকে অজ্ঞান অবস্থায়ই ফেলে আসতে পারতো কিন্তু তার মধ্যে জেগে উঠল প্রচণ্ড প্রতিশোধ স্পৃহা। প্রতিশোধের নেশায় পাগল হয়ে সে খঞ্জর দিয়ে তার বুক ঝাঝরা করে দিল এবং শেষে খঞ্জর তার বুকে বসিয়ে রেখেই চলে এল ঘরের বাইরে।

মাজেদ হেজাযী এ কাহিনী শুনে মোটেই ভীত হলো না। সে তো প্রতি মুহূর্তে কোন না কোন বিপদ মোকাবেলা করার জন্যই এ জীবন বেছে নিয়েছে।

সে মেয়েটির এ দুঃসাহসিক কাজের প্রশংসা করে তাকে জলদি ঘোড়ায় উঠতে বললো এবং নিজেও দ্রুত ঘোড়ায় উঠে বসলো।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই কমাণ্ডার দ্রুত ছুটে বাইরে এল। ছুটে গেল আস্তাবলের দিকে। চিৎকার করে বলতে থাকলো, 'ওদের ঘোড়া দিও না, আটকাও ওদের। মালকিন তার স্বামীকে হত্যা করে পালাচ্ছে।'

প্রহরীরা এ চিৎকার শুনে তলোয়ার ও বর্শা হাতে ছুটে এলো। ততক্ষণে মাজেদ ও মেয়েটি ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসেছে।

প্রহরীরা ছুটল আস্তাবলের দিকে। আস্তাবল থেকে ঘোড়া নিয়ে বেরোনোর একটিই রাস্তা, যে রাস্তা দিয়ে ছুটে আসছে প্রহরীরা।

মাজেদ সালেহাকে বললো, 'যদি ঘোড়া চালানোর অভিজ্ঞতা না থাকে তবে আমার পিছনে উঠে বসো। কারণ ওদের হাত থেকে বাঁচতে হলে প্রাণপণে ঘোড়া ছুটাতে হবে।'

সালেহা আত্মবিশ্বাস নিয়ে বললো, 'ভয় পেয়ো না, আমার ট্রেনিং আছে। তুমি ঘোড়া ছুটাও।'

মাজেদ হেজাযী বললো, 'তবে তুমি আমার পিছনে একদম লেগে থাকবে।'

মাজেদ তলোয়ার হাতে নিল। ওদিকে বডিগার্ডদের চিৎকার বেড়ে গেল। তারা হৈ চৈ করতে করতে আস্তাবলের দিকে ছুটে আসছিল।

মাজেঁদ হেজাযী তাদের দিকে মুখ করে প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। তার পিছনেই মেয়েটির ঘোড়া।
কমাণ্ডারের গর্জন ভেসে এলো, 'থামো! নইলে মারা পড়বে।'

চাঁদনী রাত। মাজেদ দেখতে পেলো, প্রহরীরা বর্শা উঁচিয়ে ছুটে আসছে। সে ঘোড়ার মুখ তাদের দিকে রেখেই প্রবল বেগে তলোয়ার ঘুরাতে লাগলো।
ঘোড়ার গতি স্বাভাবিকের চেয়ে ছিল দ্রুত। দুই বডিগার্ড বাঁধা দিতে এসে ঘোড়ার পায়ের তলে পিষ্ট হয়ে গেল। একজন বর্শা ছুঁড়ে মারলো তার দিকে, সে তলোয়ার দিয়ে সে বর্শার গতি ফিরিয়ে দিল।
'তোমরা তীর ধনুক বের করো!' চিৎকার জুড়ে দিলো কমাণ্ডার।
প্রহরীদের পেরিয়ে এলো ওরা। কিন্তু প্রহরীরাও ছিল যথেষ্ট পটু। তারা তাড়াতাড়ি তীর বের করে ছুঁড়ে মারল তীর। তাড়াহুড়োর কারণে তীর মাজেদ বা মেয়েটি কারো গায়েই লাগলো না। পর পর দুটো তীর ওদের পাশ দিয়ে শাঁ করে চলে গেল।
তীরের নিশানা থেকে বাঁচার জন্য ওরা এঁকেবেঁকে ঘোড়া ডাইনে ও বায়ে ছুটিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই তীরের আওতার বাইরে চলে এলো।
মাজেদ ভয় পাচ্ছিল, গার্ডরা ঘোড়া ছুটিয়ে পিছু ধাওয়া করবে। কিন্তু আরো কিছুদূর যাওয়ার পর তাদের সে ভয় দূর হয়ে গেল। এখন আর তাদের ধরা পড়ার কোন ভয় নেই।
আসলে ঘোড়ার পিঠে জ্বীন আঁটার জন্য যে সময়টুকু দরকার

ছিল গার্ডদের, সে সুযোগে তারা অনেক দূর চলে এসেছে।
লোকালয় থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। অনেক দূর যাওয়ার পর দূর থেকে ঘোড়ার পিছু ধাওয়ার শব্দ কানে এলো মাজেদের। সে মেয়েটিকে বললো, 'বিপদ এখনো পিছু ছাড়েনি, আমার পাশে পাশে ঘোড়া চালাতে থাকো।'
মেয়েটি ঘোড়া নিয়ে তাঁর পাশাপাশি চলতে লাগলো। মাজেদ হেজাযী বললো, 'ভয় পাচ্ছো না তো?'
মেয়েটি এর কোন উত্তর না দিয়ে সমান তালে ঘোড়া ছুটিয়ে জোরে জোরে বলতে লাগলো, 'আমি আরো অনেক গোপন কথা জানতে পেরেছি। সব কথা তোমার শোনা দরকার।'
মাজেদ বললো, 'আগে কোথাও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়ে নিই। ওখানে গিয়েই তোমার সব কথা শুনবো।'
কিন্তু মেয়েটার তর সইছিল না, সে ছুটতে ছুটতেই কথা চালিয়ে যেতে লাগলো।
মাজেদ হেজাযী বার বার তাকে চুপ থাকতে বললো। চলন্ত অবস্থায় তার কথা সব বুঝে উঠতে পারছিলো না মাজেদ। ছুটতে ছুটতেই মাজেদ বললো, 'তোমার সব কথা বুঝতে পারছি না।'
শেষে মেয়েটি অধৈর্য কণ্ঠে বললো, 'তবে থেমে যাও। আমি আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে পারছি না।'
মাজেদ থামতে চাচ্ছিল না, কিন্তু মেয়েটি হাত বাড়িয়ে মাজেদের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলো।
সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো মাজেদ, তখনই তার নজরে পড়লো তীরটি। মেয়েটির বাম দিকে গেঁথে আছে একটি তীর। মেয়েটির চলার সাথে তাল মিলিয়ে দোল খাচ্ছে সামনে,

পিছনে। মাজেদ জলদি ঘোড়া থামালো।
মেয়েটি বললো, 'আমার গায়ে তীর লাগার কারণেই আমি চলন্ত অবস্থায় সব তথ্য তোমাকে দেয়ার জন্য পেরেশান হয়েছিলাম। মরার আগেই তোমাকে তথ্যগুলো জানানো দরকার। তাই তোমাকে জোর করে থামিয়ে দিলাম।'
মাজেদ লাফিয়ে নামলো ঘোড়ার পিঠ থেকে, তারপর মেয়েটিকেও নামিয়ে আনলো। মাটিতে বসিয়ে তাকে কোলের সাথে চেপে ধরে তীর খুলতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তীর এত গভীরে প্রবেশ করেছিল যে, টেনে বের করা সম্ভব হলো না!
ওর টানাটানিতে কাতর হয়ে মেয়েটি বললো, 'ওটা রেখে দাও! আমার কথাগুলো আগে শুনে নাও! তারপর তোমার যা ইচ্ছে করো।'
সালেহা দুর্বল স্বরে বলে চললো স্বামীর কাছ থেকে উদ্ধার করা গোপন তথ্যাবলী। মাজেদ হেজাযী গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলো আইয়ুবীকে হত্যা ও তার বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর গোপন পরিকল্পনার কথা।
মেয়েটি কথা শেষ করলো এই বলে, 'আমার ধারণা, কেউ এ কথা চিন্তাও করবে না, আমরা গোপন তথ্য নিয়ে হলব থেকে পালাচ্ছি। রক্ষীদের সবাই জানতো, আমার ও তোমার মধ্যে গোপন সম্পর্ক রয়েছে, যা আমার স্বামীর মনেও সন্দেহ সৃষ্টি করেছিল। তারা এ কথাই সবাইকে বলবে। বলবে, ভালবাসার টানে পাগল হয়েই আমি তোমাকে নিয়ে পালিয়েছি।'
মেয়েটি কথা শেষ করে মাজেদ হেজাযীর হাতে গভীরভাবে চুমু খেলো এবং বললো, 'আমি এখন শান্তির সঙ্গে মরতে পারবো!' এরপরই সে জ্ঞান হারালো।

মাজেদ হেজাযী সালেহার ঘোড়া তাঁর ঘোড়ার পিছনে বেঁধে নিলো এবং আহত সালেহাকে নিজের ঘোড়ায় উঠিয়ে পিছনে বসে এমনভাবে তাকে ধরে রাখলো, যাতে বিদ্ধ তীর তাকে বেশী কষ্ট না দেয়।
কিন্তু তীর তার ক্রিয়া শেষ করেছে। মেয়েটি চলন্ত ঘোড়ার পিঠে মাজেদ হেজাযীর বুকের ওপর দেহের সমস্ত ভার চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দিল।

০

মাজেদ যখন দামেশকে কমাণ্ডার হাসান বিন আবদুল্লাহর কাছে উপস্থিত হলো, মেয়েটি কমবেশী তার বারো ঘন্টা আগে শহীদ হয়েছে।
মাজেদ হলবের রাজমহলের সমস্ত ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনার কথা শোনালো তাকে। বললো, 'এই বিরাট সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে আল্লাহর এই প্রিয় বান্দীর অপরিসীম ত্যাগ ও সদিচ্ছার ফলে।'
হাসান বিন আবদুল্লাহ তৎক্ষণাৎ মাজেদ হেজাযী ও শহীদ সালেহার লাশ নিয়ে সুলতান আইয়ুবীর কাছে গেলেন।
সুলতানের প্রশ্নের জবাবে মাজেদ হেজাযী মেয়েটি সম্পর্কে সব কথা খুলে বললো। কেমন করে তার বাবা তাকে জমিদারের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। স্বামীর সাথে কেন তার দ্বন্দ্ব হয়েছিল এবং কেন ও কেমন করে সে এসব তথ্য সংগ্রহ করে মাজেদকে দিয়েছে, সব কথাই সুলতানকে খুলে বললো সে।

পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, মেয়েটির বাবাও দামেশক থেকে পালিয়েছে।
সুলতান আইয়ুবী মেয়েটির লাশ নূরুদ্দিন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, 'এ মেয়ের দাফন সামরিক বিধি মোতাবেক স্বসম্মানে করা হবে।'

মেয়েটি মৃত্যুর আগে মাজেদ হেজাযীকে যে গোপন ষড়যন্ত্রের কথা বলেছিল, তার সংক্ষিপ্তসার হলো, সুলতান আল মালেকুস সালেহ সমস্ত মুসলিম রাজ্যগুলোর শাসকবর্গকে সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে কেবল ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবানই জানাননি, তাদের সেনাদলকে একক কমাণ্ডের অধীনে আইয়ুবীর বিরুদ্ধে অভিযান চালানোরও অনুরোধ করেছেন। ত্রিপোলীর খৃস্টান শাসক রিমাণ্ডের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছেন।
মেয়েটির দেয়া তথ্য অনুযায়ী রিমাণ্ড তার সেনাবাহিনীকে মিশর ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে পাঠাতে সম্মত হয়েছে। সেখানে তারা সুলতান আইয়ুবীর যে সব বাহিনী পাবে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে এবং সুলতানের জন্য পাঠানো রসদপত্র লুট করে নেবে, এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।
তাদের ধারণা, সুলতান আইয়ুবী যুদ্ধের সময় মিশর থেকে অবশ্যই সাহায্য চেয়ে পাঠাবে। তাছাড়াও রিমাণ্ড সুলতান আইয়ুবীকে অবরোধ করার জন্য তার তেজস্বী অশ্বারোহী বাহিনীকে সব সময় প্রস্তুত রাখবে। যদি প্রয়োজন পড়ে তবে রিমাণ্ড অন্যান্য খৃস্টান রাজাদেরও সাহায্য চেয়ে পাঠাবে।
হাসান বিন সাবাহর অনুসারী ফেদাইন দলের সাথে খলিফার চুক্তি হয়েছে। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে হত্যার বিনিময় কি হবে

তাও ঠিক করা হয়েছে এ চুক্তিতে। চুক্তি মোতাবেক ফেদাইন গ্রুপ শীঘ্রই দামেশকে অভিযান চালাতে সম্মত হয়েছে।
এসব তথ্য নিঃসন্দেহে আশংকাজনক। কিন্তু সুলতান আইয়ুবী এগুলোকে তেমন গুরুত্ব দিলেন না। তিনি গুরুত্ব দিলেন, শত্রুরা শীতকালেই যুদ্ধ শুরু করবে, এ খবরটিকে। কারণ এ সময় দামেশকে প্রচণ্ড শীত পড়ে। হালকা বৃষ্টি এবং প্রচুর বরফও পড়ে। এ আবহাওয়া যুদ্ধের অনুকূল নয়। এ অঞ্চলে কোন দিন কেউ এ মওসুমে যুদ্ধ করেনি।

মেয়েটির কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সুলতান আইয়ুবী যুদ্ধের পরিকল্পনা শুরু করলেন। সৈন্যদেরকে দুর্গের মধ্যে সমবেত করলেন। সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করলেন এবং আক্রমণের সব রকম প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন।
শীতকাল শেষ হওয়ার আগেই খৃস্টানদের সিরিয়া আক্রমণ করার কথা। এ জন্য খৃস্টান রাজা রিমাণ্ডকে যথাযথ অগ্রিম মূল্য দেয়া হয়েছে। এ মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে সোনা ও হীরা দিয়ে। বুদ্ধিমান রিমাণ্ড খলিফার প্রস্তাব এ শর্তেই কবুল করেছিলেন যে, যুদ্ধ পরিচালনার ব্যয়ভার খলিফাকে বহন করতে হবে এবং যুদ্ধের আগেই তা পরিশোধ করতে হবে। খলিফা আস সালেহ ও তার আমীররা একমত হয়ে সিদ্ধান্ত মোতাবেক সে মূল্য এরই মধ্যে পরিশোধ করে দিয়েছে।
'মুসলমানদের দুর্ভাগ্য!' সুলতান আইয়ুবী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আজ মুসলমানরা কাফেরদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নেমেছে। ওরা যদি রাসূলের (সা.) আত্মার হাহাকার ধ্বনি শুনতে পেতো তবে

কতই না মঙ্গল হতো! আমাদের জন্য এর চেয়ে অধিক কষ্টকর আর কি হতে পারে যে, একই নবীর উম্মত হয়ে আজ আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছি হাতে!'

কাজী বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ তাঁর স্মৃতিচারণ বইয়ে লিখেছেন, 'আমার প্রিয় বন্ধু সালাহউদ্দিম আইয়ুবী এত আবেগময় কখনও হননি, যেমন সে সময় হয়েছিলেন। তাঁকে যখন বলা হলো, 'আমাদের আশা ছিল, মরহুম জঙ্গীর পুত্র ইসলামের গৌরবের নিদর্শন হবেন। কিন্তু স্বার্থপর আমীরদের খপ্পড়ে পড়ে তিনি আজ ইসলামের মূল উদ্দেশ্যই ধ্বংস করতে বসেছেন। আফসোস! খৃস্টানদেরকে আরব ভূমি থেকে বিতাড়িত করে মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটানোর পরিবর্তে এখন তিনি তাদের দোসর হিসাবে কাজ করছেন।'

এ কথা শুনে সুলতান আইয়ুবীর দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। তিনি তাঁর কামরায় পায়চারী করতে করতে আবেগের সাথে বলতে লাগলেন, 'এরা আমার ভাই নয়, দুশমন! তাদের আমি অবশ্যই হত্যা করবো। দুনিয়ায় আমি বেঁচে থাকতে আমার প্রিয় রাসূলের দ্বীনকে কেউ কলংকিত ও লাঞ্ছিত করবে, এটা আমি কিছুতেই হতে দেব না। এমন শাসকের ওপর গজব নেমে আসুক, যে শাসক কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে জাতির ক্ষতি করে।'

তিনি আরো বললেন, 'আমি জানি, এরা ক্ষমতা ও অর্থের লালসায় অন্ধ হয়ে গেছে! এরা নিজেদের ঈমান বিক্রি করে গদি ও ক্ষমতা রক্ষা করতে চায়।'

তিনি তলোয়ারের বাটে হাত রেখে বললেন, 'তারা শীতকালেই যুদ্ধ করতে চায়। আমি বরফের ময়দানকে ভয় পাইনা।

শীতকালেই আমি যুদ্ধ করবো, বরফে ঢাকা পাহাড় ও পর্বতের মাঝখানেই আমি কবর রচনা করবো ওদের।'

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী কল্পনাবিলাসী লোক ছিলেন না, তিনি ছিলেন কঠোর বাস্তববাদী। কখনো আবেগতাড়িত হয়ে কাজ করতেন না তিনি। যে কোন সিদ্ধান্ত নিতেন বাস্তবতার আলোকে।

যুদ্ধের ময়দানে, বিপদসংকুল অভিযানে সমস্ত সমস্যা তিনি মোকাবেলা করতেন বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দিয়ে। তাঁর নির্দেশনা হতো সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট। তিনি কমাণ্ডারদেরকে কাগজে রেখা টেনে কিংবা মাটিতে আঙ্গুল দিয়ে দাগ টেনে বুঝিয়ে দিতেন তাঁর নির্দেশ।

কিন্তু সেদিন তাঁর হৃদয় নদীতে আবেগের ঢেউ উঠল, তিনি নিজেকে সামাল দিতে পারলেন না। তিনি এমন কথাও বলে ফেললেন, সচরাচর যে কথা তিনি বলেন না। তিনি ভাল করেই জানতেন, এ বৈঠকে যারা আছে তারা খুবই বিশ্বস্ত এবং আন্তরিক। তাদের সামনে মন উজার করে কথা বলায় কোন বিপদের আশংকা নেই।

'তাওফিক জাওয়াদ!' সুলতান আইয়ুবী দামেশকের প্রধান সেনাপতিকে বললেন, 'আমি এখন পর্যন্ত জানতে পারিনি, তোমার সৈন্যরা শীতকালে যুদ্ধ করতে পারবে কি না! উত্তর দেয়ার আগে একটু চিন্তা করে নাও, আমি গভীর রাতে সহসা কমাণ্ডো বাহিনীকে এমন স্থানে আক্রমণ চালানোর জন্য পাঠাবো, তাদেরকে হয়ত পাহাড় ডিঙাতে হবে, নদী পার হতে হবে, বরফ ও বৃষ্টির মধ্যে এগিয়ে যেতে হবে।'

'আমি আপনাকে এই আশ্বাস দিতে পারি, আমার সৈন্যরা

আপনার হুকুমে পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়তে বললে তাই পড়বে, উত্তাল সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে বললে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে। তারা জানে, আপনি যে হুকুম দেবেন তা ইসলামের কল্যাণের জন্য, আর ইসলামের জন্য জীবন বিলিয়ে দেয়ার আকাঙ্খা নিয়েই তারা আপনার পতাকা তলে সমবেত হয়েছে।'

'তুমি যা বললে তার কতটা বাস্তব আর কতটা কল্পনা?'

সেনাপতি তাওফিক জাওয়াদ বললেন, 'এর পুরোটাই বাস্তব ও সত্যি। তার প্রমাণ, তারা আপনার প্রতি আস্থাশীল বলেই স্বয়ং খলিফার হুকুমকেও অগ্রাহ্য ও অমান্য করেছে। এখনও এ জন্যই তারা আমার সঙ্গে রয়েছে। ইচ্ছে করলে তারা খলিফা আস সালেহের সাথে পালিয়ে যেতে পারতো, কিন্তু তারা তা যায়নি। এতেই প্রমাণ হয়, আমার সৈন্যরা যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভালমতই বোঝে, বোঝে কি করলে মিল্লাতের কল্যাণ ও মঙ্গল হবে।'

'হ্যাঁ, সৈন্যদের মধ্যে ইসলামী জোশ ও প্রেরণা অটুট থাকলে তারা জ্বলন্ত মরুভূমি, জমাট বরফ, এমনকি সমুদ্রের পানির ওপরও যুদ্ধ করতে পারে।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আল্লাহর সৈনিকদের গতি রোধ করতে পারে এমন কোন শক্তি নেই পৃথিবীতে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, তাদের ঈমান হতে হবে মজবুত, আল্লাহর ওপর বিশ্বাস ও আস্থা হতে হবে অনড়, অটল। যে ঈমান সম্বল করে বদরের প্রান্তরে সমগ্র আরবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন সাহাবীরা, আমাদেরও সহায় সেই আল্লাহ। আমরা যদি সে ঈমান সম্বল করতে পারি, নিশ্চয় সে বিজয়ও আল্লাহ আমাদের দেবেন।'

তিনি সমবেত কমাণ্ডার ও সেনাপতিদের লক্ষ্য করে বললেন, 'ইতিহাস হয়ত আমাকে পাগল বলবে কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্ত থেকে একচুলও নড়তে পারবো না। ডিসেম্বর মাসেই যুদ্ধ হবে। সে সময় শীতকাল মাত্র শুরু হবে। পাহাড়ের রং হয়ে যাবে সাদা। হিমেল বাতাস বইবে। রাতে কাঁপানো শীত পড়বে। তোমরা কি আমার এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারবে?'

সকলেই সমস্বরে বলে উঠলো, 'আমরা সুলতানের প্রতিটি আদেশ বিনা প্রশ্নে, বিনা প্রতিবাদে মেনে চলবো।'

সুলতানের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। এরপর তিনি এমন সব আদেশ দিলেন যার মধ্যে আবেগের ছিটেফোটাও ছিল না। তিনি বললেন, 'আজ রাত থেকেই প্রতিটি সৈনিক ও সেনাপতি খালি গায়ে শুধু পরণের বস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের ট্রেনিং দিতে শুরু করবে। এশার নামাজের পর সৈন্যরা খালি গায়ে ঝিলের মধ্যে নেমে মার্চ করবে। আমি তোমাদের প্রশিক্ষণের প্রাথমিক পরিকল্পনা বলে দিচ্ছি। ডাক্তার ও চিকিৎসকরা সৈন্যদের সাথে থাকবে। সৈন্যরা অসুস্থ্য হয়ে পড়লে, তাদের সর্দি ও ইনফ্লুয়েঞ্জা হলে ডাক্তাররা সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত সৈনিককে গরম কাপড় ও ঔষুধ দিয়ে সুস্থ্য করে তুলবে।

আমি আশা করি আস্তে আস্তে অসুখের মাত্রা কমে যাবে। সহ্য শক্তি বেড়ে যাবে সৈনিকদের। ডাক্তাররা সারাদিন সৈন্যদের দেখাশোনায় ব্যস্ত থাকবে। প্রয়োজনে আমি মিশর থেকে আরো অভিজ্ঞ হেকিম নিয়ে আসবো। এভাবেই এখন থেকে শীতকালীন যুদ্ধের প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ চলতে থাকবে।'

১১৭৪ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসের শুরু। বেশ কিছুদিন ধরেই

শীত পড়তে শুরু করেছে। রাতে শীতের তীব্রতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। একদিন সুলতান আইয়ুবী রাতের ট্রেনিংয়ের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে সেনাপতি ও কমাণ্ডারদের সামনে সংক্ষিপ্ত ভাষণ রাখলেন তিনি। বললেন, 'আমার সামরিক ভাই ও বন্ধুগণ! এখন তোমরা যে শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে যাচ্ছো তাদের দেখে তোমাদের তলোয়ার খাপমুক্ত হতে ইতস্তত: করবে। কারণ তোমাদের মতই তোমাদের শত্রুরাও আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে তোমাদের সামনে আসবে। তাদের পতাকাতেও তোমাদের পতাকার মত চাঁদ তারা যুক্ত থাকবে। তারাও তোমাদের মতই কালেমা পাঠ করবে।

তোমরা তাদেরকে মুসলমান বলে মনে করলেও তারা আসলে ইসলামের দুশমন। তাদের কোমরে তোমরা দেখতে পাবে খৃস্টানদের কোষবদ্ধ তলোয়ার। তাদের ধনুকে থাকবে খৃস্টানদের দেয়া তীর। তোমরা ধর্মের অনুসারী আর তারা ধর্ম ব্যবসায়ী। তাদের স্বঘোষিত সুলতান আস সালেহ বায়তুল মালের সোনা, রূপা এবং অর্থ সম্পদ সব সঙ্গে নিয়ে গেছে। সে এ অর্থ দিয়ে ত্রিপোলীর খৃস্টান শাসকের বন্ধুত্ব ক্রয় করেছে। খৃস্টানদের সহায়তা নিয়ে সে স্বপ্ন দেখছে তোমাদের পরাজিত করার। খোদা না করুন, সে সফল হলে পরাজিত হবে তোমরা। তোমাদের এ পরাজয় শুধু তোমাদেরই পরাজয় হবে না, এ পরাজয় হবে মুসলিম মিল্লাতের, এ পরাজয় হবে শাশ্বত ইসলামের।

আস সালেহ যে অর্থ দিয়ে খৃস্টানদের বন্ধুত্ব ক্রয় করেছে সে অর্থ তার নয়, সে অর্থ তোমাদের, সে অর্থ মুসলিম মিল্লাতের।

জাতির কষ্টার্জিত অর্থ, বিত্তবানদের ডাকাতের টাকা সে খরচ করছে শরাব ও বিলাসিতায়, খরচ করছে কাফেরদের বন্ধুত্ব ক্রয়ের কাজে। তোমরা কি জাতীয় অর্থ অপচয়কারীকে খলিফা বলে মেনে নিবে?'

সকলের সম্মিলিত 'না! না!' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল।

সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আমি যে নীতিতে আমার সেনাবাহিনী পরিচালনা করতে চাই, সেই নীতির মৌলিক কথা হলো, শত্রুর আক্রমণের অপেক্ষায় তোমরা তোমাদের ঘরে বসে থাকবে না। এটা কোন নিয়ম নয় যে, শত্রু তোমাকে আক্রমণ করবে আর তুমি কেবল সে আক্রমণ প্রতিরোধ করে যাবে।'

আল কুরআন যুদ্ধের ক্ষেত্রে যে নীতিমালা ঘোষণা করেছে তা হলো. 'যুদ্ধের মুখোমুখি হলে প্রাণপণ লড়াই করবে। যখন যুদ্ধ থাকবে না তখন সব সময় যুদ্ধের অস্ত্র ও বাহন নিয়ে প্রস্তুত থাকবে। যদি সংবাদ পাও, শত্রু তোমাদের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে, ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুদের সে চেষ্টা নস্যাৎ করে দেবে। স্মরণ রেখো, যে মুসলমান নয় সে তোমার বন্ধুও নয়। শত্রুকে যে বন্ধু মনে করে তার মত আহম্মক দুনিয়ায় আর কেউ নেই।

দ্বিতীয় নীতিমালা হলো, মুসলিম সাম্রাজ্যের অতন্ত্র প্রহরী ও জাতীয় সম্মান ও ইজ্জতের রক্ষক মুসলিম ফৌজ। যদি শাসকশ্রেণী নির্লজ্জ ও বিপথগামী হয়ে যায়, অন্যায় ও অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়ে ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়, আর সে সুযোগে শত্রু বিজয়ীর বেশে তোমাদের ওপর কর্তৃত্ব করার আশঙ্কা দেখা

দেয়, তখন তাদের প্রতিরোধ করার দায়িত্ব মিল্লাতে ইসলামিয়ার। এ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়ার জন্য সাধারণভাবে জাতির প্রতিটি সদস্যকে সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে। কিন্তু বিশেষভাবে এ দায়িত্ব বর্তাবে সেনাবাহিনীর ওপর।

যদি তোমরা এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হও তবে পরবর্তী প্রজন্ম তোমাদের দুর্বল ও অযোগ্য বলে অভিহিত করবে। সরকারের ব্যর্থতা ও তাদের দোষক্রটির জন্য যদি কোন জাতির ক্ষতি হয় তবে তার জন্য প্রথমেই দায়ী হয় সেনাবাহিনী। কারণ, জাতি সেনাবাহিনীর ওপরই তাদের নিরাপত্তা ও জান-মালের হেফাজতের জিম্মা সোপর্দ করে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে চায়। এ জন্যই তারা সেনাবাহিনীর ভরণ-পোষণের খরচ বহন করে। জাতির এত বড় জিম্মা নিয়ে সাধারণ মানুষের মত নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকার কোন অধিকার নেই সেনাবাহিনীর কোন সদস্যের।

জয়-পরাজয় যুদ্ধের ময়াদানেই হয়। আমরা জানি, সরকারের স্বার্থপরতা ও বিলাসিতা সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে দেয় এবং জাতিকে বিপদগামী করে ফেলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্ত পরাজয়ের গ্লানি সেনাবাহিনীর কাঁধেই চাপিয়ে দেয়া হয়। যে সরকার জাতির স্বার্থ রক্ষা করতে পারে না, সেনাবাহিনীর আনুগত্য পাওয়ার কোন হক নেই তাদের। তাহলে তোমরা কিসের জন্য অপেক্ষা করছো? জনগণের স্বার্থ লুণ্ঠনকারী অবৈধ ও লুটেরা সরকারকে উৎখাত না করে কেন তোমরা জনগণের অভিশাপ কুড়াচ্ছো?

এ অথর্ব সরকার আমাদের জাতীয় জীবনের ক্ষতি ও সর্বনাশ করছে। আমি এ সর্বনাশ চোখ বুঝে সহ্য করতে পারি না।

তাই আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছি। জানিনা এর ফলাফল কি হবে, কেমন হবে। আমি শুধু জানি, একটা তুমুল যুদ্ধ হবে। হয় আমরা জিতবো, নয়তো নিঃশেষ হয়ে যাবো, কিন্তু কিছুতেই গোলামীর শিকল পড়বো না।

এ যুদ্ধকে আমি কঠিন লড়াই বলছি এ জন্য যে, আমি তোমাদের প্রচণ্ড শীতের মধ্যে যুদ্ধের ময়দানে ঠেলে দিচ্ছি। তাছাড়া তোমাদের সৈন্য সংখ্যাও কম। এই ঘাটতি তোমাদেরকে পূরণ করতে হবে ঈমানী শক্তি ও শাহাদাতের তামান্না দিয়ে।'

সুলতান আইয়ুবী তাদের আরো বললেন, 'তোমাদের মধ্যে যদি শত্রুদের গোয়েন্দা থাকে তাদের কিভাবে সনাক্ত করবে এবং তাদের নিয়ে কি করবে সে সম্পর্কে তোমাদের আগেই বলেছি। এখন শুধু বলতে চাই, এ দিকটির প্রতি সব সময় সজাগ ও সচেতন থাকবে।'

০

'তোমরা এ কথা বিশ্বাস করো না যে, সুলতান আইয়ুবী মুসলমান! পয়গম্বরের পরেই খলিফার কদর। সেই খলিফার বিরুদ্ধে যে অস্ত্র ধরে সে মুরতাদ। নাজমুদ্দিন আইয়ুবীর বেটা সালাহউদ্দিন আইয়ুবী মুরতাদ হয়ে গেছে। সে খলিফাকে তার মহল থেকে বের করে দিয়েছে। সিরিয়ার ওপর জবর দখল নিয়েছে। সে এখন মিশর ও সিরিয়ার ওপর তার একচ্ছত্র বাদশাহী দাবী করছে।

সে আমাদের ধর্মীয় নেতাদের শ্রদ্ধা করে না, পীর মাশায়েখদের বিরোধিতা করে। তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো, সে সর্প কেল্লার পীরকে গ্রেফতার করেছে।

যদি তোমরা আল্লাহর অভিশাপ থেকে বাঁচতে চাও, ভূমিকম্প ও তুফান থেকে বাঁচতে চাও, তবে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করতে হবে। খলিফাকে তাঁর সম্মান ও মর্যাদাসহ তাঁর সিংহাসনে আবার বহাল করতে হবে।'

হলবের ময়দানে খলিফার সৈন্যদের সামনে এই বক্তৃতা করছিলেন একজন আমীর। তিনি সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে সৈন্যদের উত্তেজিত করতে চাচ্ছিলেন।

তিনি আরও বললেন, 'এই শীত শেষ হওয়ার আগেই আমরা দামেশকের ওপর আক্রমণ করবো। এর মধ্যে আমাদের আরো অনেক সৈন্য বেড়ে যাবে। বিশাল বাহিনী নিয়ে আমরা আঘাত হানবো আইয়ুবীর ওপর। তার রাজা হওয়ার লোভ চিরতরে মিটিয়ে দেবো।'

'ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও নাশকতা চালানোর প্রস্তুতি না থাকলে তোমরা যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে না।' আস সালেহের দরবারে বসে বললেন রাজা রিমাণ্ডের দূত। তিনি আরো বললেন, 'আমরা আপনাদের সাথে মিলে কোন শহরে এসে যুদ্ধ করতে পারবো না। মিশর থেকে সুলতান আইয়ুবীর জন্য যে সাহায্য আসবে আমরা সেগুলো পথে আটকাবো, লুট করে নেবো এবং সুযোগ পেলে সুলতান আইয়ুবীর সাহায্যে এগিয়ে আসা বাহিনীকে অবরোধ করে রাখবো। আপনার সৈন্যরা দামেশকের ওপর আক্রমণ চালাবে।'

'আপনারা এটুকু সাহায্য করলেই চলবে। সুলতানের মোকাবেলা করার জন্য আমাদের বাহিনীই যথেষ্ট।'

'আমার প্রস্তাব হচ্ছে, শীতকাল পার করে আপনারা যুদ্ধ যাত্রা করুন। শীতকালে আপনার সৈন্যদের পক্ষে যুদ্ধ করা কঠিন হয়ে যাবে। আমাদের জন্যও তা কঠিন হবে।'

'আমরাও প্রায় তেমনটিই ভাবছি। শীত শেষ হয় হয় অবস্থায় আমরা আক্রমণ করতে চাই, যাতে সুলতানের বাহিনীর প্রস্তুতির আগেই আমরা তাদের ধরাশায়ী করতে পারি।' বললেন এক উপদেষ্টা।

'কিন্তু আমার মধ্যে একটা আশংকা কাজ করছে। আপনাদের যুদ্ধ হচ্ছে ভাইয়ে ভাইয়ে। আপনাদের সৈন্যরা না আবার আপত্তি করে বসে যুদ্ধ করতে!'

'কি যে বলেন! আইয়ুবীকে খলিফা মুরতাদ বলে ঘোষণা করেছেন। মুরতাদের বিরুদ্ধে জেহাদের প্রেরণা নিয়েই আমাদের সৈন্যরা লড়াই করবে। এ ব্যাপারে নিয়মিত তাদেরকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য আমরা বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছি।'

'আরো একটি পদক্ষেপ নিতে পারেন আপনারা। বিভিন্ন মুসলিম রাজ্যগুলোতে তার বিরুদ্ধে জনগণকে উস্কিয়ে তুলুন। এই যুদ্ধে কুরআন ও ধর্মের দোহাই বড়ই কার্যকরী পন্থা হবে। কুরআন ও মসজিদকে ব্যবহার করুন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে।

আমরা দেখেছি, মুসলমানরা ধর্মের ব্যাপারে খুবই দুর্বল। ধর্মের নামে সহজেই তারা উত্তেজিত হয়ে উঠে। খলিফা চাইলে এ কাজে আমাদের সাহায্য নিতে পারেন।

আমাদের বাইবেল সোসাইটির মত একটি কোরআন

সোসাইটিও আমরা আপনাদের গড়ে দিতে পারি। যার নেপথ্যে আমরাই থাকবো, কিন্তু পরিচালনায় থাকবে আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিছু মুসলমান আলেম। এই আলেমদের তত্ত্বাবধানে মাঠে ময়দানে যারা কাজ করবে তারা এর মূল কলকাঠি কারা নাড়াচ্ছে, কোত্থেকে নাড়াচ্ছে, কিছুই জানতে পারবে না। তারা সরল মনে ইসলামী জযবা নিয়ে ঘুরে ঘুরে আইয়ুবীর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাবে।

কোরানের দোহাই দিয়ে তারা বলবে, খলিফার বিরুদ্ধে কেউ অবস্থান নিলে ইসলাম তাকে মুরতাদ বলে। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল এই মুরতাদদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য বলেছে। আইয়ুবী খলিফার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে মুরতাদ হয়ে গেছে। এই মুরতাদদের হাত থেকে যারা জাতিকে বাঁচাতে চান, অবিলম্বে জেহাদের খাতায় নাম লেখান তারা।'

'কিন্তু এতে কি লোকেরা আমাদের দলে নাম লিখাবে?'

'আপনাদের দলে কতজন নাম লেখালো সেটা বড় কথা নয়, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে আইয়ুবী। ঈমানদার মুসলমানরাও তাকে বিশ্বাস করবে না, তার দলে নাম লেখাবে না, এরচে বড় সাফল্য আর কি চান!

আইয়ুবী নিজেকে ইসলামের রক্ষক বলে দাবী করছে। তার ডাকে যেন জনগণ সাড়া না দেয় সে জন্য ইসলামের রক্ষক সাজতে হবে আপনাদের। তখন কে যে ইসলামের রক্ষক আর কে নয়, এই নিয়ে জনগণ পড়বে দ্বিধাদ্বন্দ্বে। এই দ্বন্দ্বের কারণে আইয়ুবীর ডাকে সাড়া দেবে না জনগণ। আপনারা চাইলে এই তৎপরতা আমরা দামেশকেও দেখাতে পারি।'

'আপনার বুদ্ধি দেখে আমার মাথা লজ্জায় হেট হয়ে গেছে।

প্রায় পাঁচ মাস ধরে চেষ্টা করেও আমাদের খুনী গ্রুপ সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করতে পারলো না। আপনি যে পথ বাতলেছেন এতে তো সে খুন হয়ে যাবে!' ফেদাইন খুনী দলের মুরশিদ পীর শেখ মান্নানের কণ্ঠ থেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ঝরে পড়লো।

'আরে খুন নয়, এ যে খুনের বাড়া।' বললো খলিফার এক উজির।

বৈঠকে খুনী চক্র ফেদাইন গ্রুপের নেতা মান্নান জানালো, 'সুলতান আইয়ুবীকে হত্যার জন্য যাদের পাঠিয়েছিলাম তাদের প্রচেষ্টা চার বার ব্যর্থ হয়েছে। শুধু ব্যর্থই হয়নি, তাদের দুজন নিহত হয়েছে, বন্দী হয়েছে তিনজন। হাসান বিন সাবাহের আত্মা এখন আমার কাছে এর জন্য জবাবদিহি চাচ্ছে।'

'তোমরা কি তাকে বিষ প্রয়োগও করতে পারলে না? গোপনে কোথাও থেকে তীরের নিশানাও বানাতে পারলে না? তোমরা এতই আনাড়ি, এতই ভীতু?' দূত ফেদাইন নেতা মান্নানকে তিরস্কার করলো।

মান্নান নত মস্তকে বললো, 'জানিনা ওরা শপথের কথা ভুলে গেছে কিনা? এত ট্রেনিং দিয়ে, এতসব কায়দা কানুন শিখিয়ে যাদের পাঠালাম, তারা সব কি করে এমনভাবে ব্যর্থ হলো বুঝে আসে না। জানিনা, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী জীবিত আছেন এ কথা আর কতদিন শুনতে হবে?'

'তিনি আর বেশী সময় জীবিত থাকবেন না।' নেতার আক্ষেপ শুনে একজন ফেদাইন কর্মী বললো। সাথে সাথে সায় জানাল তার সাথীরাও।

সুলতান আইয়ুবীর অবশিষ্ট সৈন্যরা মিশরেই অবস্থান করছিল। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল সুলতানের ভাই আল আদিল। সুলতান আইয়ুবী তাঁকে এই হুকুম দিয়ে এসেছিলেন, 'দ্রুত নতুন সৈন্য ভর্তি করো এবং সামরিক ট্রেনিং আরো জোরদার করো।'

তিনি আল আদিলকে সুদানের ব্যাপারেও সাবধান করেছিলেন। বলেছিলেন, 'সুদানের তরফ থেকে যদি সামান্য আক্রমণও আসে তবে এমনভাবে তার মোকাবেলা করবে, যেনো আর কখনো এ ধরনের দুঃসাহস করার খায়েশ তাদের না জাগে।' সুলতান আইয়ুবী আরও বলেছিলেন, 'সব সময় সৈন্যদের প্রস্তুত রেখো। যে কোন সময় আমি সাহায্য চেয়ে পাঠাতে পারি।'

দামেশকের ব্যাপারে এখনও কিছু বলা যাচ্ছে না। যুদ্ধ বাঁধলে পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেবে বলা মুশকিল। পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূলে রাখতে হলে আরো সৈন্যের প্রয়োজন। তিনি যে পরিকল্পনা করেছেন তা সফল করতে হলে সাহায্যের প্রয়োজন। শহীদ সালেহার রিপোর্ট অনুযায়ী ত্রিপোলীর শাসক রিমাণ্ড মিশর ও সিরিয়ার মধ্যে যোগাযোগের পথে বাঁধার সৃষ্টি করবে। সুলতান আইয়ুবীর জন্য ছুটে আসা সাহায্য সামগ্রী লুট করবে তারা।

এ খবর পেয়ে সুলতান আইয়ুবী সিদ্ধান্ত নিলেন, ওরা এসে পৌঁছার আগেই প্রয়োজনীয় সাহায্য সংগ্রহ করে নিতে হবে। তাছাড়া শীতকালে যুদ্ধ করার মত ট্রেনিং দেয়ার জন্যও তাদের আগেভাগেই দামেশকে নিয়ে আসা দরকার। তিনি দীর্ঘ এক চিঠি লিখলেন ভাইকে। তারপর সে চিঠি কাসেদ মারফত পাঠিয়ে দিলেন কায়রোতে।

চিঠিতে তিনি আল আদিলকে জানালেন, কি পরিমাণ পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী পাঠাতে হবে। সেই সাথে এও বললেন, 'সমস্ত সৈন্য এক সাথে পাঠাবে না। তাদের পাঠাবে ছোট ছোট দলে ভাগ করে। রাতের অন্ধকারে গোপনে পথ চলতে বলবে তাদের। একজন অন্য জন থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে পথ চলবে। দিনের বেলায় কোন গোপন স্থানে বিশ্রাম করবে। যতদূর সম্ভব সাহায্য সামগ্রী গোপন রাখতে বলবে। সৈনিকের পোষাকের বদলে ওদের পথ চলতে বলবে সাধারণ মুসাফিরের বেশে।

ছোট ছোট দলে উটের পিঠে সাহায্য সামগ্রী নিয়ে ওরা যখন পথ চলবে, তখন যেন সোজা ও বড় রাস্তায় না এসে যতটা সম্ভব সংকীর্ণ ও ঘুরপথে আসে। সন্দেহজনক কেউ পথে পড়লে তাকে ভালমত তল্লাশী করতে বলবে। জিজ্ঞাসাবাদের পর প্রয়োজন মনে করলে তাকে গ্রেফতার করতে হবে।

কয়েকদিন পর। নিরাপদেই দামেশকে এসে পৌঁছতে লাগলো সাহায্য বহর। সুলতান আইয়ুবী নবাগত সৈন্যদেরকে নৈশ ট্রেনিংয়ে অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। সেই সাথে আরও নতুন সৈন্য ভর্তি চলতে থাকলো।

০

দামেশকের আশপাশের এলাকা। এলাকাটা পাহাড়, জঙ্গল, খাল ও নালায় পরিপূর্ণ। শহরের বাইরে এক জায়গায় বহু

বছরের পুরাতন এক দূর্গের ধ্বংসাবশেষ।
এর মধ্যে অনেকদিন কোন মানুষ প্রবেশ করেনি। রাতে লোকেরা তার পাশ দিয়েও যেত না। ব্যবহারের অযোগ্য সেই দূর্গের দিকে ফিরেও তাকাতো না কেউ। সৈন্যরাও সেদিকে নজর দেয়ার কোন প্রয়োজন মনে করতো না। সেই পুরাতন কেল্লাকে লোকেরা 'নাগু' কেল্লা বলতো।
লোক মুখে প্রচলিত আছে, সেখানে এক জোড়া নাগ-নাগিনী বাস করে। সেই নাগ-নাগিনীর বয়স নাকি প্রায় হাজার বছর। লোকমুখে আরও শোনা যায়, মহাবীর আলেকজাণ্ডার এই কেল্লা তৈরী করেছিলেন। আবার কেউ বলেন, ইরানের এক বাদশাহ এটা প্রস্তুত করেছিলেন। কেউ আবার একে বনি ইসরাইলীদের তৈরী বলেও মনে করেন।
এ ব্যাপারে সবচে মশহুর কাহিনী হচ্ছে, পারস্যের এক বাদশাহ একবার এখানে এসেছিলেন। স্থানটি তাঁর এতই পছন্দ হয়েছিল যে, এখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণের ইচ্ছে জাগল তার। তিনি একটি মনোরম প্রাসাদ তৈরী করালেন। তার পাশে তৈরী হলো এক কেল্লা।
কিন্তু সে মহলে বাস করার মত বাদশার কোন বেগম ছিল না। সে অভাব পূরণের জন্য তিনি একটি মেয়ে খুঁজতে লাগলেন। এক মেষ পালকের মেয়েকে তার বড় পছন্দ হলো। কিন্তু সেই মেয়ে ছিল অন্য এক লোকের বাগদত্তা। মেয়েটিও ভালবাসতো তাকে।
কিন্তু রাজার খায়েশ বলে কথা! তিনি মেয়ের মা-বাবাকে অগাধ ধন-সম্পদ দিয়ে মেয়েটিকে কিনে নিলেন।
মেয়েটির প্রেমিক বাদশাহকে বললো, 'এ অন্যায় মাহারাজ!

আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, আপনি ওকে মুক্তি দিন।'

বাদশাহ তার কথায় কর্ণপাত করলেন না। তখন যুবক বাদশাহকে শাসিয়ে বললো, 'এই মেয়েকে নিয়ে আপনি এ প্রাসাদে বাস করতে পারবেন না। আমার অভিশাপ এ প্রাসাদকে বিরাণ করে ফেলবে।'

এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বাদশাহ মেয়েটিকে মুক্তি দেয়ার পরিবর্তে তার প্রেমিককে ধরে নিয়ে মহলের মধ্যে হত্যা করলো। তারপর তাকে পুতে রাখলো মহলেরই ভেতর।

মেয়েটি বাদশাহকে বললো, 'আপনি আমার দেহটা খরিদ করতে পারলেও আমার আত্মাকে কোনদিন বশীভূত করতে পারবেন না। আমার হৃদয় ওই যুবকের সম্পদ। সে সম্পদ আমি কাউকে দিতে পারবো না।'

প্রথম রাতে বাদশাহ যখন মেষ পালকের মেয়েকে রাজ পোষাকে সজ্জিত করে মহলের পালঙ্কে নিয়ে গেলেন, তখন সাজানো পালঙ্ক মেঝেতে বসে গেল। প্রাসাদের দেয়াল ও ছাদ ধ্বসে পড়ে বাদশাহ ও মেয়েটিকে জীবন্ত কবর দিয়ে দিল।

বাদশাহর সৈন্যরা ইট-সুড়কি সরিয়ে যখন তাদের উদ্ধার করতে গেলো, তখন দেখলো, সেখানে কোন মানুষের হাড়গোড়ও নেই। এক জোড়া নাগ-নাগিনী ফনা তুলে বেরিয়ে এলো সেখান থেকে। সৈন্যরা সাপ দু'টোকে মারার জন্য বর্শা ও তলোয়ার নিয়ে ছুটে গেলো। কিন্তু কোন অস্ত্রই তাদের গায়ে লাগলো না।

সৈন্যরা ভয় পেয়ে কিছুটা দূরে সরে এলো। সেখান থেকে তারা সাপ দু'টোর দিকে তীর ছুঁড়তে লাগলো। কিন্তু কোন তীরই তাদের গায়ে লাগলো না। সাপ দু'টোর কাছে গিয়েই

তীর অন্য দিকে ফিরে যায়। এই দেখে সৈন্যরা ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এল।

এ কথাও লোক মুখে শোনা যায়, রাতে কেল্লার পাশ দিয়ে গেলে দেখা যায় একটি সুন্দরী মেয়ে মেষের পাল চরিয়ে বেড়াচ্ছে। কখনো কখনো সেই সুন্দর যুবককেও দেখা যায়। সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করে, এ কেল্লায় এখন জ্বীন-পরী বাস করে।

সুলতান আইয়ুবী যখন খলিফা আস সালেহ ও তাঁর আমীরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত, সে সময় একদিন গুজব শোনা গেল, ঐ সর্প কেল্লায় একজন বুজুর্গ পীর সাহেব এসেছেন। তিনি যদি দোয়া করেন তবে সকল রোগ দূর হয়ে যায়। আর তিনি ভবিষ্যত বাণীও করতে পারেন।

শহরে তার কেরামতির কথা এ-মুখ ও-মুখ করে সবার মাঝেই ছড়িয়ে পড়লো। কেউ কেউ তাকে ইমাম মেহেদী বলেও উল্লেখ করলো।

লোকজন সেখানে যাওয়ার জন্য এবং হুজুরকে এক নজর দেখার জন্য খুবই উদগ্রীব। কিন্তু সাহসে কুলোয় না। ওদের ভয়, হুজুর মেষ পালকের মেয়ের সেই প্রেমিক যুবক বা পারস্যের সেই বাদশাহর প্রেতাত্মা নয় তো! কেউ কেউ আবার ভাবলো, নিশ্চয়ই এটা জীন বা ভূতের কারবার।

কিন্তু মানুষের কৌতুহল বড় খারাপ জিনিস। এ জিনিস একবার কাউকে পেয়ে বসলে কৌতুহল নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত তার নিস্তার নেই। তাই লোকজন এক পা, দু পা করে কেল্লার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। কেউ কেউ দূরে দাঁড়িয়ে কেল্লার দিকে তাকিয়ে থাকতো।

একদিন তিন চারজন লোক বললো, 'আমরা কেল্লার পাশ দিয়ে আসছিলাম, দেখলাম, একজন কালো দাড়িওয়ালা লোক সাদা পোষাক পরে কেল্লার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখেই তিনি ভিতরে চলে গেলেন।'

লোকজনের কানে হুজুরের কেরামতির নানা কথা পৌঁছতে লাগলো। কিন্তু এমন একজনও পাওয়া গেল না, যে সাহস করে কেল্লার ভিতরে ঢুকবে। অথবা সরাসরি হুজুরের দোয়া নিয়ে এসেছে এমনও কাউকে পাওয়া গেল না।

একদিন সুলতানের রক্ষীবাহিনীর এক সৈনিক তার ডিউটি শেষ করে ব্যারাকের বাইরে ঘোরাফেরা করছিল। এ যুবক ছিল খুব সুদর্শন ও সুপুরুষ।

এই সুদর্শন যুবকের সামনে একজন নূরানী চেহারার লোক এলো। তাঁর মুখে কালো দাড়ি, কিন্তু তা পরিপাটি ও ভাল মতো আঁচড়ানো। তার গায়ের জামাটি ধবধবে সুন্দর এবং মাথায় আকর্ষণীয় পাগড়ী। তাঁর হাতে একটি তসবিহ এবং অনবরত তিনি তা টিপে চলেছেন।

তিনি রক্ষী বাহিনীর সেই সৈন্যের কাছে এসে থেমে গেলেন। তাঁকে থামতে দেখে সৈনিকটিও দাঁড়িয়ে পড়লো। তিনি রক্ষীর থুতনি ধরে মুখখানা একটু উপরে তুলে ধীরে ধীরে বললেন, 'আমার তো ভুল হবার কথা নয়! তুমি কোথাকার বাসিন্দা বন্ধু?'

'বাগদাদের!' যুবক শান্ত স্বরে উত্তর দিল। 'আপনি কি আমাকে চেনেন?'

'হ্যাঁ, বন্ধু! আমি তোমাকে চিনি। কিন্তু তুমি আমাকে চেন না।'

যুবক এ কথায় একটু বিস্মিত হলো এবং তাঁর বলার ভঙ্গিতে আকৃষ্টও হলো। নূরানী চেহারার লোকটির দিকে ভাল করে তাকাল যুবক। তার দাড়ি পরিপাটি সুন্দর, পোষাক উজ্জ্বল সাদা। সৈনিকটি তাঁকে একজন দরবেশ বলে ধরে নিল।

লোকটির চোখে কেমন নেশা ধরানো আলো, যুবক মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে সে দিকে তাকিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো।

'তোমার পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে কিছু জানো তুমি? তারা কে ছিলেন, কি ছিলেন?' জিজ্ঞেস করলেন হুজুর।

'না!' সৈনিক জবাব দিলো।

'তোমার দাদাকে দেখেছো?'

'না!'

'তোমার বাবা জীবিত আছেন?'

'না!' রক্ষী বললো, 'আমি যখন দুগ্ধপোষ্য শিশু তখন বাবা মারা যান।'

'এদের মধ্যে কে বাদশাহ ছিলেন? তোমার বাবা? দাদা? তোমার পর দাদা?'

'কেউ নয়।' রক্ষী উত্তর দিল, 'আমি কোন রাজবংশের সন্তান নই। আমি সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর রক্ষী দলের একজন সাধারণ সৈনিকমাত্র। আপনার দৃষ্টিভ্রম হতে পারে। আমার চেহারা আপনার কোন পরিচিত জনের মত হতে পারে।'

হুজুর যেন তার কথা শুনতেই পেলেন না, তিনি তার হাত ধরে ডান হাতের তালু গভীর ভাবে লক্ষ্য করে রেখাগুলো দেখতে লাগলেন। শেষে চোখে খুশীর ঝিলিক এনে, হেসে তার চেহারার দিকে ভাল করে তাকিয়ে বিজ্ঞের মত বললেন, 'আমার দৃষ্টিতে এ সিংহাসন কার, এ রাজমুকুট কার লক্ষ্য

করছি? তোমার চোখে সেই রাজকীয় শান-শওকত এখনও আছে, যা তুমি দেখতে পাও না।

তোমার দাদার দেহরক্ষীর মধ্যে চল্লিশজন যুবক তোমার মতই সুদর্শন ছিল। আজ তুমি সেই লোকের দেহরক্ষী হয়েছ, যে তোমার দাদার সিংহাসনে জোরপূর্বক বসে আছে। তোমাকে কে বলেছে, তুমি রাজবংশের সন্তান নও? আমার বিদ্যে আমাকে মিথ্যা বলতে পারে না। আমার চোখ ভুল দেখতে পারে না। তুমি কি বিয়ে করেছ?'

'না! তবে বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে।'

হুজুর বললেন, 'তোমার এ বিয়ে হবে না।'

'কেন হবে না?' উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেস করলো যুবক।

'তোমার আত্মার মিলন অন্য কারো সাথে লেখা আছে।' হুজুর বললেন, 'কিন্তু সে এখন কোথাও বন্দী।'

রক্ষী যুবক হুজুরের এ কথায় আরো হতভম্ব হয়ে গেল। সে প্রশ্নবোধক চোখে তাকিয়ে রইল হুজুরের দিকে।

'শোন বন্ধু! তুমি এখন মজলুম। কারোর প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে আছো, তুমি বিভ্রান্ত হয়ে আছো। তোমার ধনরত্নের ওপর সাপ বসে পাহারা দিচ্ছে। সে আসলে সাপ নয়, এক রাজকুমারী। সে তোমার পথ চেয়ে বসে আছে। সেটি ঠিক কোন জায়গা আমি চিনতে পারছি না। যদি কখনো কেউ তোমাকে বলে দেয় তার সন্ধান, তুমি জীবন বাজী রেখে তাকে মুক্ত করতে চলে যেও।'

হুজুর কথা বন্ধ করে আবারো তার দিকে তাকিয়ে খুশীর ঝিলিকমারা একটি হাসি দিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলেন।

নূরানী চেহারার সেই দরবেশের ছবি গেঁথে রইল যুবকের

মনে। কিছুক্ষণ তার কোন হুশ ছিল না। হঠাৎ সম্বিত ফিরে আসতেই সে দৌড়ে গিয়ে হুজুরকে থামালো।

'আপনি আমাকে বলে যান, আমার হাতে, আমার চোখে, আপনি আসলে কি দেখেছেন? আপনি কে? কোথেকে এসেছেন আপনি? আপনি আমাকে বিভ্রান্ত করে, আমার চিত্তকে অশান্ত ও চঞ্চল করে কোথায় চলে যাচ্ছেন?'

'আমি কিছুই নই!' হুজুর বললেন, 'যা কিছু অলৌকিক ক্ষমতা দেখছো, সবই সে আল্লাহ পাকের জাত। তিনি চারটি পবিত্র আত্মা আমাকে দান করেছেন। এগুলো আল্লাহ্‌র বড় নেক বান্দাদের আত্মা। যারা অতীতের সংবাদ বলতে পারে, ভবিষ্যতের খবরও বলতে পারে।

আমি প্রতিদিন অজিফা পাঠ করি। একদিন ধ্যান-তন্ময় হয়ে অজিফা পাঠ করছি, হঠাৎ মনে হলো আমি আমার পরিচিত জগতে নেই। আমি চোখ মেললাম। এমন এক অবর্ণনীয় সৌন্দর্যের জগতে আবিস্কার করলাম নিজেকে, যা কোনদিন ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ্‌র ইশারায় আমি আবার অজিফায় মগ্ন হয়ে গেলাম। তখনি এ আত্মাগুলো পেয়ে গেলাম আমি। এ আত্মাগুলো যখন আমার ওপর ভর করে তখন আমি অনেক কিছু বলে দিতে পারি। তখন আমার মধ্যে এমন এক সম্মোহনী শক্তি কাজ করে যে, মানুষের চেহারা ও চোখের দিকে তাকালে তাদের বাপ-দাদা ও পরদাদার ছবিও দেখতে পাই। কিন্তু এই অবস্থা আমার মধ্যে সব সময় থাকে না, মাঝে মধ্যে আসে।

যখন আমি তোমাকে দেখলাম, তখন আমি সেই সম্মোহনী অবস্থাতে ছিলাম। কানের মধ্যে ফিস্‌ফিস্ ধ্বনি শুনতে পেলাম,

'ঐ যুবকটাকে দেখো, সে একজন শাহজাদা! রাজকুমার!! কিন্তু সে তার ভাগ্যলিপি থেকে অজ্ঞাত। সে তার অতীত ভবিষ্যত কিছুই জানে না। এখন সে এক সাধারণ সৈনিকের বেশে অপরের রক্ষী হয়ে কাজ করে যাচ্ছে।
যুবক, সত্যি কথা বলতে কি, এখন আর আমার মধ্যে সে মোহময় অবস্থা নেই। সে অবস্থা কেটে গেছে আমার। এখন তোমাকে আমি শুধু এক সৈনিকই দেখতে পাচ্ছি।'

মানুষের এ এক প্রাকৃতিক দুর্বলতা যে, প্রত্যেক মানুষই অর্থ-সম্পদ, মান-সম্মান ও প্রতিপত্তির স্বপ্ন দেখে। এই যুবক যখন অর্থ-সম্পদ ও রাজকুমারীর একটু ইশারা পেলো তখন তা পাওয়ার জন্য তার মনে আকাংখার জন্ম হলো।
হুজুর একটু হেসে বললো, 'আমার কাছে জ্যোতিষীর কোন বিদ্যে নেই, আমি কোন ভবিষ্যত বক্তাও নই। আমি শুধু আল্লাহ ভক্ত এক দরবেশ মাত্র। যদি আবার আমার মধ্যে সেই সম্মোহনী শক্তি ভর করে, আমি চেষ্টা করবো তোমার সম্পর্কে আরও কিছু জেনে নিতে। কিন্তু তোমাকে সে কথা জানাবো কি করে? তোমাকে কোথায় পাবো?'
'আপনি কষ্ট করে আমাকে সংবাদ দিবেন এমন কথা বলে আমাকে গোনাহগার বানাবেন না। আপনাকে কোথায় পাবো বলেন, আমিই আপনার সাথে দেখা করবো।'
'আমি যেখানে আসতে বলবো তুমি কি সেখানে আসতে পারবে?'
'হাঁ, পারবো, অবশ্যই পারবো। আপনি যেখানে বলবেন সেখানে গিয়েই দেখা করবো আমি।'

'সাপের কেল্লার মধ্যে আসতে পারবে?'
'অবশ্যই পারবো!'
'আজ রাতে?'
'জ্বি।'
হুজুর বললেন, 'গোসল করে পাক-পবিত্র হয়ে দুনিয়ার খেয়াল থেকে মনকে মুক্ত করে আসবে। আর মনে রাখবে, এ কথা যেন আর কেউ জানতে না পারে। আমি তোমাকে ডেকেছি ও তোমার সাথে সাক্ষাৎ করেছি, এ কথা জানাজানি হলে সেই সম্মোহনী শক্তি আর নাও আসতে পারে। রাতে অতি গোপনে তুমি সর্প কেল্লায় চলে আসবে।'

০

যদি ধনরত্ন, রাজকুমারী, রাজ্য ও রাজমুকুটের লোভ না হতো, তবে এ সৈনিক যত সাহসী বীরই হোক না কেন, রাতের অন্ধকারে ঐ সাপের কেল্লায় কখনও যেতো না।
সুলতান আইয়ুবীর পিছন দরজায় সন্ধ্যা রাতে ডিউটি পড়লো তার। মাঝরাতে ডিউটি বদল হলো। ডিউটি শেষে সে আর ব্যারাকে ফিরে গেল না, সেখান থেকেই সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়লো সর্প কেল্লার উদ্দেশ্যে।
সে যখন ভাঙা কেল্লার দরজায় এসে পৌঁছলো তখন তার মনে অজানা ভয় ও শিহরণ ঢুকে গেল। ভয় তাড়ানোর জন্য সে উচ্চস্বরে বলতে লাগলো, 'কোথায় আপনি? আমি, আমি এসে গেছি।'

তাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। একটি মশাল জ্বেলে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো এক লোক। লোকটিকে দেখে তার মনের ভয় দূর না হয়ে আরও জেঁকে বসলো।
মশাল উঁচিয়ে লোকটি তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি সেই লোক, হুজুরের সাথে যার রাস্তায় দেখা হয়েছিলো?'
'হ্যাঁ, আমিই সেই লোক।' যুবক বললো।
লোকটি তখন বললো, 'আমার পেছন পেছন এসো!'
'তুমি কি মানুষ?' সৈনিক ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো তাকে।
'তুমি আমাকে যেমন দেখছো, আমি ঠিক তাই। মন থেকে সব ভয় দূর করে দাও। আজগুবি কল্পনা ও সন্দেহ থেকে মনকে মুক্ত করো। নিরবে অনুসরণ করো আমাকে।'
'হুজুর এখন....।'
সে প্রশ্ন শেষ করতে পারলো না, তাকে থামিয়ে দিয়ে মশালবাহী বললো, 'অহেতুক প্রশ্ন করবে না। তোমার মনের সব প্রশ্নের জবাব পাবে হুজুরের কাছে।'
আগে আগে চলতে লাগলো মশালধারী, পেছনে যুবক। কেল্লার ভেতর অসংখ্য সরু গলি, পেঁচানো বারান্দা, সিঁড়ি অতিক্রম করে তারা এগিয়ে চললো।
'হুজুরকে আর কোন প্রশ্ন করবে না। তিনি যা আদেশ করেন তাই করবে। এমন কিছু করবে না, যাতে তিনি অসন্তুষ্ট হতে পারেন। অত্যন্ত আবেগ ও ভক্তি সহকারে তার সামনে যাবে।'
ভাঙা দেয়াল ও ছাদ থেকে খসে পড়া ইট-সুরকির মধ্য দিয়ে, ঘুটঘুটে অন্ধকার গলিপথে যেখানে এসে থামলো মশালধারী, সেখানে একটি বন্ধ দরজা দেখতে পেল যুবক। মশালধারী লোকটি দরজার কাছে এসে উচ্চস্বরে বললো, 'ইয়া হযরত!

যদি আদেশ দেন তবে ভেতরে আসি। আপনি যাকে আসতে বলেছিলেন, সে এসেছে।'

ভেতর থেকে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে উত্তর এলো, 'ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

মশালবাহী একদিকে সরে গিয়ে ওকে ইঙ্গিত করলো ভেতরে যেতে।

দুরু দুরু বুকে ভিতরে প্রবেশ করলো রক্ষী। ঢুকেই তার চক্ষু চড়কগাছ, এমন ভয়ংকর ভগ্ন কেল্লার মাঝে এমন রাজকীয় আসবাবপত্রে সাজানো কামরা আছে, এ কথা সে কল্পনাও করেনি! মানুষের দৃষ্টিচক্ষুর অন্তরালে এ এক আলাদা জগত। মেঝেতে দামী কার্পেট, তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে আছেন হুজুর। তিনি চোখ বন্ধ করে তসবিহ জপছিলেন। সেই ধ্যানমগ্ন অবস্থায়ই তিনি ওকে বসতে ইশারা করলেন।

সে কামরার এক কোণে বসে গেল। বিচিত্র সুগন্ধে মৌ মৌ করছিল কামরা। যুবক অবাক চোখে তাকিয়ে রইল দরবেশের দিকে।

কিছুক্ষণ পর ধ্যানমগ্ন হুজুর চোখ খুলে সিপাহীকে দেখতে পেয়েই হাতের তসবিহ ছুঁড়ে মারলেন তার দিকে। বললেন, 'এটা গলায় পরে নে।'

যুবক তসবীতে চুমু দিয়ে আদবের সাথে গলায় পরে নিল। কামরার মধ্যে শামাদানে প্রদীপ জ্বলছিল বিভিন্ন রঙের।

হুজুর হাততালি দিলো, সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল পাশের কামরার দরজা। সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো এক অনিন্দ্য সুন্দরী। মেয়েটির চুল খোলা। হাঁটু পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে সে চুল। যুবক এমন রূপসী নারী জীবনে কখনও দেখেছে কিনা মনে করতে

পারলো না।
তার হাতে এক সুন্দর পেয়ালা, পিয়ালাটি সে এগিয়ে ধরল যুবকের দিকে। হুজুর উঠে পাশের কামরায় চলে গেলেন।
যুবক পিয়ালাটি হাতে নিয়ে একবার পিয়ালার দিকে আবার মেয়েটির দিকে তাকাতে লাগলো।
মেয়েটি বললো, 'হুজুর এইমাত্র ধ্যান ভাঙলেন তো, কিছুক্ষণ বিশ্রাম না নিয়ে তিনি এখানে আসতে পারবেন না। তুমি এ শরবত পান করে আরাম করে বসো।'
মেয়েটির মুখে এমন হাসি, যে হাসিতে ছিল অন্তরঙ্গতার আমন্ত্রণ। রক্ষী যুবক পিয়ালা হাতে নিয়ে মুখে লাগালো এবং এক ঢোক পান করে আবার মেয়েটির দিকে তাকালো।
'কি দেখছো যুবক, তোমার মত এমন সুন্দর সুঠাম যুবককে আমি শরবত পান করাতে পারছি, এ তো আমার সৌভাগ্য।'
মেয়েটি তার কাঁধের ওপর হাত রেখে বললো, 'পান কর। আমি এই শরবত নিজ হাতে তৈরী করেছি।' হুজুর আমাকে বলেছিলেন, 'আজ রাতে এখানে এক রাজপুত্র আসবে। সেই সুপুরুষ যুবককে প্রাণ ভরে আপ্যায়নের দায়িত্ব তোমার। তাকে খুশী করতে পারবে তো?'
সিপাহী আবার পেয়ালা ঠোঁটে ঠেকাল এবং ঢক ঢক করে সমস্ত শরবত পান করে ফেললো। মেয়েটি তার পাশে বসলো এবং অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো যুবকের দিকে।
তার মনে হলো, সে মেয়েটির দেয়া শরবত পান করছে, আর মেয়েটি পান করছে এক যুবকের সুঠাম দেহের যাদুময় সৌন্দর্য।
মেয়েটি তার একান্ত সান্নিধ্যে এসে তার দুটি হাত কাঁধের ওপর

তুলে দিল এবং মায়াময় চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুমি এত সুন্দর কেন?'
যুবকের সারা শরীর শিহরিত হলো। মনে হলো, শরবতের সাথে মেয়েটির রূপসুধাও তার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চারিত হয়ে মিশে যাচ্ছে।

•

ওরা তখনো আলাপে মশগুল, হুজুর এসে প্রবেশ করলেন কামরায়। তাঁর হাতে কাঁচের এক গোলক, সাইজে অনেকটা আপেলের মত। তিনি গোলকটি যুবকের হাতে দিয়ে বললেন, 'তোমার চোখের সামনে ধরে রাখো আর এর মধ্যে কি আছে গভীর দৃষ্টিতে তা অবলোকন করো।'
যুবক কাঁচের গোলকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। সে দেখতে পেল, বিভিন্ন রংয়ের অনেকগুলো আলোর শিখা কাঁপছে গোলকের ভেতর।
মেয়েটিও তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিল গোলকের দিকে। তার রেশমের মত কোমল চুল যুবকের গাল স্পর্শ করছিলো। মেয়েটি আরো ভাল করে গোলকের ভেতর কি হচ্ছে দেখার জন্য যুবকের কোমর জড়িয়ে ধরে দাঁড়ালো। এতে সে মেয়েটির গায়ের সুগন্ধ ও যৌবনের উষ্ণতা অনুভব করছিল।
এক সময় সে অনুভব করলো, গোলকের ভেতর সে আলোর শিখাগুলো আর নেই। আস্তে আস্তে সেখানে ভেসে উঠল এক সিংহাসন।
সে বিড় বিড় করে উচ্চারণ করলো, 'একটা সিংহাসন।' তেমনি বিড়বিড় করেই হুজুর বললেন, 'হযরত সোলায়মানের সিংহাসন।'

সে যেন হুজুরের কথা শুনতেই পায়নি, তার মনে হলো এটা তারই কণ্ঠস্বর। হুজুরের সাথে সাথে সে বলতে লাগলো, 'আমি হযরত সোলায়মানের সিংহাসন দেখতে পাচ্ছি।'
সে এই একই কথা গুণ গুণ করে বার বার বলতে লাগলো। শেষে সে আর স্বাভাবিক জগতের মানুষ থাকলো না। সে ঐ কাঁচের গোলকের জগতেই মগ্ন হয়ে গেল।
সে হযরত সোলায়মানের সিংহাসনের দিকে তাকিয়ে থাকলো। দেখতে পেলো তার ওপর এক নূরানী চেহারার বাদশাহ বসে আছেন। তার ডানে, বামে এবং পিছনে দু'জন করে মোট ছয়টি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
মেয়েগুলো অপূর্ব সুন্দরী। দেখে মনে হচ্ছিল যেন পরীর দল। সে গুণ গুণ করছিল, 'হাঁ, তখতে সোলায়মানে বসে আছেন বাদশাহ সোলায়মান।... ছয়টি পরী ঘিরে আছে তাঁকে।'
মেয়েটি তার দেহের ভার যুবকের ওপর চাপিয়ে তখনো তাকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়েছিল। বাদশাহ সোলায়মানের জায়গায় এবার অন্য একজন লোককে দেখতে পেল সে।
এমন সময় কথা বলে উঠলেন দরবেশ, 'কাঁচের গোলকের মধ্যে সিংহাসনে বসা এই বাদশাহ তোমার দাদা, যিনি বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক ছিলেন। সম্রাট সোলায়মানের পরীগণ ও জ্বীনেরা তাঁর দরবারে তাকে সিজদা করতো। তোমার দাদাকে চিনে নাও। এগুলো তোমার ওয়ারিশের জিনিস! এ সিংহাসন এবং আশপাশে যা দেখতে পাচ্ছো, এ সবই তোমার।'
হঠাৎ সিপাহী হতচকিত হয়ে বললো, 'হায় হায়! একি! সিংহাসন তো নিয়ে যাচ্ছে! ওরা কারা? এত বড় বড় দৈত্য! এত ভয়ংকর! সিংহাসন উঠিয়ে ওরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?'

সিংহাসন হারিয়ে গেল। কাঁচের গোলকে ফিরে এলো আবার আলোর শিখা। শিখাগুলো থর থর করে কাঁপছে, যেন পাগলা নৃত্য শুরু করেছে ওরা।

আইয়ুবীর রক্ষী বাহিনীর এই সদস্য অনুভব করলো, কামরায় নতুন ধরনের একরকম সুগন্ধি ভেসে আসছে। আস্তে আস্তে কাঁচের গোলকটি অন্ধকার হয়ে গেল এবং তার চোখের সামনে থেকে সব দৃশ্য অদৃশ্য হয়ে গেল। সে বেহুশের মত নির্বাক, নিশ্চল হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল।

মেয়েটি যখন তার কাঁধ ধরে ঝাকি দিল এবং তাকে বার বার ডাকতে লাগল তখন তার হুঁশ ফিরে এলো। সে এতটাই কাহিল হয়ে পড়ল যে, সংজ্ঞাহীনের মত গালিচার ওপর লুটিয়ে পড়ল।

মেয়েটির ডান হাত তার মাথার নিচে পড়ে ছিল। মেয়েটি ঝুঁকে পড়ে তাকে উঠে বসার জন্য টানাটানি করতে লাগলো।

সৈনিক উঠে বসলো। বিস্মিত, অভিভূত, শ্রান্ত-ক্লান্ত এই রক্ষীর মুখ থেকে প্রথম যে কথা বের হলো, তা হলো, 'এই সিংহাসন আমার দাদার! আমি এই সিংহাসনের ওয়ারিশ!'

'হাঁ, হুজুর তো তাই বললেন!' মেয়েটি অতি কোমল স্বরে বললো।

'হুজুর এখন কোথায়?' সিপাই জিজ্ঞেস করলো।

'এখন তাঁকে পাওয়া যাবে না।' মেয়েটি উত্তর দিল, 'তুমি তো বলেছিলে রাতের শেষ প্রহরে তোমার ডিউটি, সে কারণে আমি তোমাকে জাগিয়ে দিলাম। রাত অর্ধেকের বেশী পার হয়ে গেছে। তুমি কি এখন ডিউটিতে যাবে?'

সেখান থেকে বের হতে মন চাচ্ছিল না তার। সে বললো,

'আচ্ছা, সত্যি করে বলো তো, আমি যা দেখেছি তা কি স্বপ্ন, না বাস্তব?'

মেয়েটি তাকে বললো, 'কেন, তোমার কি অবিশ্বাস হয়? তুমি তো আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এসব দেখোনি যে, এটা স্বপ্ন হবে। হুজুর অলৌকিক ক্ষমতাবলে গোলকের ভেতর তোমার অতীত তুলে এনেছিলেন। তুমি হুজুরের এ ক্ষমতা অস্বীকার করতে চাও?'

'না না, তিনি মিথ্যে বলতে যাবেন কেন? কিন্তু....'

'হুজুরের ওপর হুকুম হচ্ছে, তিনি যেন কোন গোপনীয়তা নিজের কাছে লুকিয়ে না রাখেন। কারো কোন গোপন তথ্য পেলে তা যেন তার কাছে পৌঁছে দেন। কিন্তু এই অবস্থা হুজুরের সব সময় হয় না। কখনও কখনও অলৌকিকতা তাঁর ওপর ভর করে। কেবল তখনই তিনি কারো গোপনীয়তা জানতে পারেন।'

রক্ষী সেনা মেয়েটিকে অনুনয় বিনয় করে বলতে লাগলো, 'আমাকে হুজুরের কাছে নিয়ে চলো।'

মেয়েটি বললো, 'তুমি আমার ওপর ভরসা রাখো। কি করে তুমি তোমার সিংহাসন ফিরে পেতে পারো হুজুরের কাছ থেকে তা আমি নিশ্চয়ই জেনে দেবো। এখন হুজুরের সাথে দেখা করে কোন লাভ হবে না। আমার এই দেহ আর আত্মা সবই তোমাকে দিয়ে দিলাম। তোমার জন্য আমার জীবন পড়ে রইল। আজ বরং তুমি ফিরে যাও।

ডিউটিতে না গেলে তোমার বিপদ হতে পারে। তাই আমার পরামর্শ হচ্ছে, এখন তুমি চলে যাও। কাল রাতে আবার এসো। আমি হুজুরের কাছে আবেদন করবো, তুমি কি করে

হারানো রাজ্য ফিরে পেতে পারো তিনি যেন তা জেনে দেন। আমার ভালবাসার দোহাই, এসব কথা তুমি এখন কাউকে বলো না।'

সে যখন কেল্লা থেকে বের হচ্ছিল, তখন তার পা আর হাঁটতে চাচ্ছিল না। তার মাথার মধ্যে তার দাদার সিংহাসন চেপে বসেছিল আর অন্তরে অনুভব করছিল মেয়েটির ভালবাসা। ভালবাসার আবেশে অন্ধকার রাতে কেল্লার এই ধ্বংসাবশেষও তার কাছে মনে হচ্ছিল অপূর্ব সুন্দর। সে উৎফুল্ল মনে, ভয় ও ক্লান্তিহীন চিত্তে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর ঘরের দিকে এগিয়ে চলল।

০

সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সকল তৎপরতা যুদ্ধের পরিকল্পনা ও সেনাবাহিনীর ট্রেনিংয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি নিজের ও কেন্দ্রীয় সামরিক অফিসারদের আরাম হারাম করে দিয়ে এ কাজে লেগেছিলেন।

গোয়েন্দা ইনচার্জ হাসান বিন আবদুল্লাহ গোয়েন্দা কর্মীদের নিয়ে মহাব্যস্ত। কিন্তু তার ফাঁকেও খেয়াল করলেন, সুলতান অসম্ভব পরিশ্রম করছেন। নিজের দিকে তাঁর কোন খেয়াল নেই।

সুলতানের দেহরক্ষীরা সব হাসান বিন আবদুল্লাহর নিয়োজিত। তারা কয়েকবারই হাসানের কাছে অভিযোগ করেছে, 'সুলতান কাউকে কিছু না জানিয়ে পিছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান। আর এদিকে সুলতান ভিতরে কাজে ব্যস্ত আছেন ভেবে আমরা খালি

কামরা পাহারা দিয়ে যাই।'

এ জন্য কমাণ্ডার সুলতান আইয়ুবীর সঙ্গে দু চারজন বডিগার্ডকে ছায়ার মত লাগিয়ে রাখতে চাইলেন। কমাণ্ডার সুলতান আইয়ুবীকে বললেন, 'যেখানে ফেদাইনরা আপনাকে হত্যা করার জন্য মরিয়া হয়ে পিছু লেগে আছে, সেখানে এভাবে অরক্ষিত অবস্থায় আপনার চলাফেরা করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। মেহেরবানী করে আপনি আরেকটু সতর্ক হোন।'

কিন্তু সুলতান এ কথায় তেমন কর্ণপাত করলেন না, তিনি আগের মতই সম্পূর্ণ বেপরোয়াভাবে চলাফেরা করতে লাগলেন।

এতে হাসান বিন আবদুল্লাহ খুবই পেরেশানীর মধ্যে পড়ে গেল। সে অনুনয় বিনয় করে সুলতানকে বললো, 'দয়া করে আপনি বডিগার্ড ছাড়া একাকী বাইরে যাবেন না।'

সুলতান আইয়ুবী হেসে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'এত অস্থির হচ্ছো কেন, আমাদের সকলের জীবন একমাত্র আল্লাহর হাতে। দেহরক্ষীদের সামনেই তো আমার উপরে চারবার আক্রমণ এসেছে। বেঁচে গেছি, সে তো আল্লাহর ইচ্ছা। আমি তো আল্লাহর সঠিক রাস্তাতেই আছি। যদি সেই জাতে বারিতালার আমাকে বাদ দেয়ার ইচ্ছা থাকে, তবে তার ইচ্ছাকে, না আমি বাঁধা দিতে পারবো, না আমাকে বডিগার্ডরা রক্ষা করতে পারবে।'

'তবুও সুলতানে মুহরাতারাম!' হাসান বিন আবদুল্লাহ বললো, 'আপনার এই একীনের ওপর নির্ভর করে আমরা বসে থাকতে পারি না। আমার কাছে ফেদাইনদের যে সব রিপোর্ট আসছে তাতে রাতেও আপনার শিয়রে পাহারা রাখা অপরিহার্য হয়ে

পড়েছে আমার ওপর।'

'আমি তোমার রক্ষীদের ডিউটির প্রশংসা করি হাসান!' সুলতান আইয়ুবী বললেন। 'কিন্তু বডিগার্ড নিয়ে বাইরে গেলে আমার মনে হয়, আমার জাতির উপরে আমার মোটেই বিশ্বাস নেই। সেই শাসকগোষ্ঠীই তার জাতিকে ভয় পায়, যারা জনগণের স্বার্থ হরণ করে তারা কখনও জনগণের ওপর আস্থা রাখতে পারে না।'

'ভয় তো জাতিকে নয়!' হাসান বিন আবদুল্লাহ বললেন, 'আমি ফেদাইনদের কথা বলছি।'

'ঠিক আছে, আমি সাবধান থাকবো।' সুলতান আইয়ুবী হেসে বললেন।

সাপের কেল্লা থেকে ফিরে রক্ষী তার ডিউটিতে চলে গেল। মানসিক যাতনার মধ্য দিয়ে সময় কাটতে লাগলো তার। বার বার কেবল সেই সিংহাসন ও মেয়েটির কথাই ঘুরপাক খেতে লাগল তার মাথায়। পুরো দিনটি এভাবেই এক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে কেটে গেল।

সন্ধ্যা থেকেই সে সর্প কেল্লায় যাওয়ার জন্য ছটফট করতে লাগল। রাত একটু গভীর হতেই পা বাড়াল সেদিকে। তার অন্তরে এখন আর কোন ভয়ভীতি, শংকা নেই।

সে কেল্লার দরজায় পৌঁছে অন্ধকারেই ভেতরে ঢুকে গেল। বেশ কিছুদূর এগিয়ে গত রাতের মত হাঁক ছাড়লো, 'আমি এসেছি, আমি কি সামনে অগ্রসর হবো?'

তাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, মশালের আলো দেখা গেল। মশালবাহী তার কাছে এসে বললো, 'তুমি

অবশ্যই হুজুরের পায়ে সিজদা করবে। তিনি আজ কারো সাথে সাক্ষাৎ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তবু তুমি যখন এসেছো, চলে এসো।'

গত রাতের মত সে অন্ধকার পথ মাড়িয়ে মশালবাহীর পিছনে পিছনে হুজুরের কামরার দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। আগের মতই হুজুর ভিতরে যাওয়ার হুকুম দিলে সুলতানের গার্ড তার পায়ে গিয়ে মাথা রাখলো এবং আবেদন জানালো, 'ইয়া হযরত! আপনি আমাকে আমার গোপনীয় তথ্য দান করুন। বলুন, আমি কিভাবে আমার উত্তরাধিকার ফিরে পেতে পারি?'

হুজুর হাতের তালি বাজালো। সঙ্গে সঙ্গে সেই মেয়ে পাশের কামরা থেকে বের হয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়ালো। তার মুখে সেই অমায়িক মধুর হাসি।

যুবক তাকে নিজের পাশে বসতে বললো। হুজুর মেয়েটিকে বললেন, 'এ যুবক আজ আবার কেন এসেছে? তাকে তো তার সব অতীত দেখানো হয়েছে। এখন আবার সে কি চায়?'

'ইয়া হযরত! এই গোনাহগার বান্দা আপনার মুরীদ হতে চায়। তার অতীত অপরাধ আপনি ক্ষমা করে দিন!' মেয়েটি বললো, 'এই বান্দা অনেক আশা নিয়ে আপনার দরবারে এসেছে।'

মেয়েটির অনুনয়ে পীর সাহেব অগত্যা রাজি হলেন আবার সেই অলৌকিক জগতে প্রবেশ করতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই কাঁচের গোলকটি তার সামনে ধরা হলো। তার আগেই মেয়েটি তাকে শরবত পান করিয়েছে।

গোলকটি চোখের সামনে নিয়ে হুজুরের সুমিষ্ট সুরের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সিপাহী গুণগুণ করতে লাগল। তার কণ্ঠ থেকে ভেসে এলো, 'আমার সামনে শাহ সোলায়মানের সিংহাসন

দেখা যাচ্ছে! আমি সোলায়মানের মহল দেখতে পাচ্ছি! উহু! আমার সামনে এখন আমার পূর্ব পুরুষদের শাহী মহল দেখতে পাচ্ছি। এই মহলেই আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম। হ্যাঁ, এই মহলেই আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম।'

সে বার বার একই ধ্বনি উচ্চারণ করতে লাগলো. 'আমি এই মহলেই জন্মগ্রহণ করেছিলাম।' সে অনুভব করতে লাগলো, যেন এই শব্দটি তার অস্তিত্বের সাথে মিশে গেছে। সে এই শব্দের মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেললো।

সে দেখতে পেল, শাহী মহলের মাঝে প্রশস্ত বাগান। সেই বাগানের মাঝে ছুটাছুটি করছে সে।

তার কাছ থেকে কাঁচের গোলকের অস্তিত্ব হারিয়ে গেল। এখন এ মহল ও বাগানই তার কাছে নিরেট বাস্তব। বাগানের প্রতিটি গাছপালা, ফুল-ফল সব কিছুতেই লেগে আছে তার হাতের স্পর্শ। সে এখন সেই ফুলের সুবাস অনুভব করতে পারছে। সে কোন সাধারণ সিপাই নয়, সে একজন রাজকুমার, শাহজাদা!

কখন এই মহল শূন্যে মিলিয়ে গেছে, কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে, কিছুই মনে করতে পারলো না সে। যখন তার চেতনা এলো, তখন দেখতে পেল, মেয়েটির কোলে পড়ে আছে সে।

এরপর মেয়েটির সাথে তার অনেক আলাপ হলো। মেয়েটি তাকে বললো, 'হুজুর বলে গেছেন, এই শাহজাদা তার রাজ্য ফিরে পাবে, কিন্তু কবে, তা এখনো বলা যাচ্ছে না। আগে জানতে হবে, তার সিংহাসন ও রাজমুকুট কোথায় আছে, কার অধিকারে আছে। তারপর জানতে হবে, সেই সিংহাসন উদ্ধারের উপায় কি? এর জন্য সময় প্রয়োজন।'

মেয়েটি বললো, হুজুর বলে গেছেন, 'সবকিছু জানতে সাত আট দিন লাগতে পারে, আর গোলক ব্যবহারের জন্য প্রতিদিনই তোমার দরকার হবে। এখন কি করবে তুমি ভেবে দেখো।'

০

তার পরের দিনগত রাতেও সে আবার ঐ সাপের কেল্লায় গেল। এবার সে চারদিনের ছুটি নিয়ে এসেছে। মেয়েটি তাকে আগের মতই শরবত পান করালো। এরপর তার হাতে তুলে দেয়া হলো সেই স্বচ্ছ স্ফটিক গোলক। কেউ কিছু বলার আগেই সে কাঁচের গোলক চোখের সামনে মেলে ধরলো, আর তাতে প্রদীপ শিখার নাচন দেখতে লাগলো। তার চোখে বিভিন্ন রংয়ের শিখা ক্রমাগত নেচে বেড়াচ্ছিল।

আইয়ুবীর রক্ষী যখন কাঁচের গোলকের মধ্যে এ সব দৃশ্য দেখতো এবং দেখতে দেখতে বেহুশ হয়ে যেত তখন মেয়েটি সিপাহীর হাত থেকে ঐ গোলক সরিয়ে নিয়ে রেখে দিত।

তৃতীয় রাতেও তাই হলো। হুজুর তার সামনে বসে চোখে চোখ রেখে যাদুময় স্বরে আস্তে আস্তে বলতে থাকেন, 'এই ফুল, এই বাগান, আমি এই বাগানে খেলা করেছি।'

সে এই কথা বার বার বলতে লাগল, মেয়েটি সৈনিকটির গা ঘেঁষে বসে তার মাথার চুলে বিলি কাটতে থাকল।

সিপাহী তন্ময় হয়ে বাগানের দৃশ্য দেখছে। চারদিকে সবুজের সমারোহ, কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু। সেখানে ফুটে আছে রঙ

বেরঙের ফুল। সে ফুলের মাতাল করা ঘ্রাণ তাকে যেন পাগল করে দিচ্ছে।

সিপাহী দেখতে পেল, বাগানে একটি মেয়ে গুণগুণ সুরে গান গাইছে। সে মেয়েটি তার পাশে বসা যুবতীর চেয়েও বেশী সুন্দরী।

মেয়েটির পরণে রাজকুমারীর পোষাক। সিপাহী এখন আর এই সাপের কেল্লাতে বসে নেই। সে চলে গেছে সেই রাজকন্যার পাশে, বাগানে।

যদিও তার সামনে বসে আছে হুজুর, পাশে সেই যুবতী, কিন্তু সে সম্পর্কে তার এখন কোন অনুভূতিই নেই।

সে বাগানের মেয়েটির কাছে দৌড়ে গেল। মেয়েটিও দৌড়ে এল তাকে দেখে। ওরা পরস্পর কাছাকাছি হলে মেয়েটি তার গলায় পরিয়ে দিল ফুলের মালা।

মেয়েটির শরীর থেকেও ফুলের সুবাস ছড়িয়ে পড়ছিল। ওরা দু'জন হাত ধরাধরি করে বাগানের এক কোণে চলে গেল। সেখানে ঘাষের ওপর বিছানো মখমলের কোমল বিছানা। তাতে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে তাজা ফুল।

ওরা সেখানে বসে পড়ল। মেয়েটি বিছানার কোণে রাখা একটি সুরাহী তুলে নিল হাতে। সেখান থেকে শরাব ঢেলে পিয়ালা পূর্ণ করে এগিয়ে দিল যুবকের দিকে। যুবক ঠোঁট ছোঁয়ালো পিয়ালায়। আহ্ কি মিষ্টি! নেশা জাগানো মধুর শরাব!

শরাবের নেশা মাখানো দৃষ্টি নিয়ে ও আবার তাকালো মেয়েটির দিকে। আগের চেয়েও অনেক বেশী সুন্দর ও মোহনীয় লাগছে মেয়েটিকে।

মেয়েটি পটলচেরা চোখে তাকালো রাজপুত্রের দিকে। সুরের

মত মধুর শব্দ তরঙ্গ তুলে বললো, 'আমি কতকাল ধরে তোমার অপেক্ষায় এখানে বসে আছি! এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?'

যুবক কিছু বলতে যাবে, এমন সময় কয়েকজন মুখোশধারী দৈত্যাকার লোক এসে মেয়েটিকে ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগল। মেয়েটি চিৎকার করে উঠল 'বাঁচাও, বাঁচাও' বলে।

সে দৌড়ে গেল মেয়েটিকে উদ্ধার করতে। কিন্তু কয়েকজন তাকেও জাপটে ধরে অন্য দিকে সরিয়ে নিতে লাগল। এই হট্টগোলে হাতের গোলকটি কোথায় ছিটকে পড়ল বলতে পারবে না সে।

সে হঠাৎ তাদের হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে দৌড় দিলো বাঁচার তাগিদে। দেয়ালে বাড়ি খেয়ে সম্বিত ফিরে এলো তার। তখনো মেয়েটির হৃদয় বিদারক চিৎকার তার কানে আঘাত করছিলো।

সে রাগে দুঃখে পাগলের মত ঘুরে দাঁড়াতেই দেখতে পেল দরবেশ ও তার সঙ্গী মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

ওদের দেখেই সে চিৎকার করে উঠল, 'এসব আমি কি দেখলাম?'

'তুমি তোমার অতীত জীবনটাই দেখছিলে।' হুজুর তাকে বললেন, 'আমি তোমাকে ফিরিয়ে এনেছি।'

'আমি তো সেখান থেকে ফিরে আসতে চাইনি।' সে অধীর কণ্ঠে বললো, 'কেন আপনি আমাকে ফিরিয়ে আনলেন, বলুন, কেন আনলেন?'

সে কাঁদতে লাগলো আর বলতে লাগলো, 'আমাকে সেখানেই

পাঠিয়ে দিন। আপনার পায়ে পড়ি, হুজুর, আপনি আমাকে সেখানেই পাঠিয়ে দিন।' সে দেয়ালে মাথা ঠুকতে লাগলো।

'সেখানে গিয়ে কি করবে তুমি?' হুজুর বললেন, 'যার জন্য যেতে চাও, সে তো এখন অন্যের অধিকারে। তুমি যতক্ষণ অপহরণকারীকে হত্যা করতে না পারবে, ততক্ষণ তুমি তাকে পাবে না। আমি চাই না, তুমি খুনোখুনির মধ্যে জড়িয়ে পড়ো। আর সে ব্যক্তি এমন শক্তিশালী যে, তাকে হত্যা করা সহজ ব্যাপার নয়।'

যুবক চিৎকার করে বললো, 'আপনি শুধু বলুন, সে মেয়েটি এখন কোথায়? কার কাছে আছে?'

'ওকে এখন আর তুমি খুঁজে পাবে না। যারা ওকে ছিনিয়ে নিয়েছে তারা তোমার চেয়েও শক্তিশালী। তুমি আর কখনও তাকে দেখতে পাবে না। মেয়েটাকে যে ধরে নিয়ে গেছে সে এখন সিংহাসনে বসে আছে, যে সিংহাসনে তোমার বসার কথা ছিল। তার পিছনে না লাগাই তোমার জন্য উত্তম।'

'আমি তাকে অবশ্যই খুঁন করবো।' চিৎকার করে বললো সে, 'যত বড় শক্তিমানই হোক, আমি কাউকে ভয় পাই না। সে যদি আইয়ুবীর চেয়েও শক্তিশালী হয় তবু তাকে আমার হাতে মরতে হবে। খোদার দোহাই লাগে, আপনি শুধু বলুন, কে সেই ছিনতাইকারী? এখন সে কোথায় আছে?'

'কিন্তু সে কথা বললে যে আমিও এ খুনের দায়ে পড়ে যাবো বন্ধু!' হুজুর বললেন।

সৈনিক যুবক তার পায়ের ওপর মাথা কুটে বার বার বলতে লাগলো, 'ইয়া হযরত! আমার ওপর রহম করুন। একবার শুধু বলুন, সে এখন কোথায়?' সে হুজুরের পা ধরে কাঁদতেই

থাকলো। কিন্তু হুজুর কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না।
মেয়েটি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল নারী ও গদীর জন্য দিওয়ানা এক পাগলের আহাজারি।
অসুখে ধরেছে দেখে সে মনে মনে খুশী। কিন্তু সেইভাব গোপন করে চেহারায় রাজ্যের দুশ্চিন্তা নিয়ে সেও এবার দরবেশের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'হুজুর আমার মা-বাপ, তাকে আপনি নিরাশ করবেন না। একটু দয়া করুন, নইলে এ যুবক বাঁচবে না। তখন আপনি একজন নিরপরাধ মানুষ খুনের দায়ে পড়বেন। একটু দয়া করুন হুজুর।'
যেন ওদের অনুরোধেই মন গললো দরবেশের। তিনি বললেন, 'এত করে যখন বলছো, তখন আমি এক কাজ করতে পারি। আবার সেই ক্রীস্টাল বল দাও ওর হাতে। আমি কিছুই বলবো না। যদি তার ভাগ্য ভাল থাকে তবে সে নিজেই দেখতে পাবে রাজকন্যা এখন কোথায় আছে, কে তাকে অপহরণ করেছে।'
ওকে আবার সেই জগতে পাঠিয়ে দেয়া হলো। শাহী মহল ও শাহী বাগ-বাগিচায় ঘুরতে ঘুরতে এক সময় সে বলে উঠলো, 'এই যে আমার দাদার খুনী, এই আমার বাবার খুনী। এই লোক আমার সিংহাসন ও রাজমুকুট আত্মসাৎকারী। আরে! এই লোকই তো আমার ভালবাসার মেয়েকে বন্দী করে রেখেছে!'
পরক্ষণেই সে আবার আৎকে উঠে বলতে লাগলো, 'না, না! এটা হতেই পারে না। এ যে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী! তিনি... তিনি এ কাজ করতে যাবেন কেন?'
তখন কামরায় গমগম করে উঠলো এক অচেনা কণ্ঠস্বর, 'সত্য বড় নির্মম ও নিষ্ঠুর হয় যুবক! তোমাকে আগেই বলা হয়েছিল

এ পথে তুমি পা বাড়িয়ো না। তুমি সে নির্দেশ শোননি। এখন তোমার ভাগ্যের খুনীকে দেখে ভয়ে পালাতে চাচ্ছো!
শোন, এ ব্যক্তি সুলতান হতে পারে না, এ ব্যক্তি আরবী নয়, কুর্দি! তুমি আরব! তুমিই বলো, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী তোমার দাদার খুনী না হলে সিংহাসন পেলো কি করে? কি করে এক কুর্দি আরবদের সুলতান হয়?
এখন সমস্ত রহস্য ও ভেদ তোমার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তুমি যদি প্রতিশোধ নিতে ব্যর্থ হও তাহলে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে এ ক্ষমতা তুমি হারাবে। স্বপ্নে সে দেখতে পাবে তোমাকে তার হন্তারকরূপে। তখন সে তোমাকে খুন করবে। এ রহস্য ভেদ হওয়ার পর তোমাদের দু'জনের একজনকে খুন হতেই হবে। এখন বলো, কে খুন হবে, সে, না তুমি?'
ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল সিপাহীর চেহারা। সে বিড়বিড় করে বলতে লাগলো, 'সালাহউদ্দিন আইয়ুবী! হ্যাঁ, এ ব্যক্তি আমার দাদার খুনী! আমার বাবার খুনী! আমার রাজ্য ও সিংহাসনের অন্যায় অধিকারী! আমার ভাগ্যের খুনী! তাকে হত্যা না করলে সে আমারও খুনী হবে। না না, এ সুযোগ তাকে দেয়া যায় না। তাকে আমি অবশ্যই খুন করবো। আমি আমার বাবার খুনের বদলা নেবো, আমার দাদার খুনের বদলা নেবো! প্রতিশোধ! হ্যাঁ, চরম প্রতিশোধ নেবো আমি।'
শেষে এমন হলো, তার চোখের সামনে সুলতান আইয়ুবী ছাড়া আর কোন দুশমন রইল না। তার ধ্যানে, তার চোখের সামনে, কল্পনায় শুধুই এক দুশমন ঘুরপাক খেতে লাগলো, আর সে দুশমন হলো সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী।
রক্ষী সেনার হাতে আবার কৃস্টাল বল তুলে দেয়া হলো। সে

দেখতে পেল, আগে আগে যাচ্ছেন সুলতান আইয়ুবী। পেছনে খঞ্জর হাতে এগিয়ে যাচ্ছে সে। কিন্তু সুলতানকে হত্যার কোন সুযোগই পাচ্ছে না। অন্যান্য পাহারাদাররা ঘিরে রেখেছে তাকে।

এক সময় সে মেয়েটিকেও দেখতে পেল। একটি পাখীর পিঞ্জরায় বন্দী করে রাখা হয়েছে তাকে। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী পিঞ্জরার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে পাষণ্ডের মত হাসতে লাগলেন তিনি।

মেয়েটি উদ্ভাস করুণ চোখে তাকিয়ে আছে সিপাহীর দিকে। সুলতান আইয়ুবীর চেহারায় ক্রমশ নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার ছায়া নেমে আসছে। সিপাহীর কানে কে যেন ফিসফিস করে বলে যাচ্ছে, 'এই সে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী! তোমার দাদার খুনী! বাবার খুনী.......!'

০

সুলতান আইয়ুবী আপন কামরায় তাঁর উপদেষ্টা ও সামরিক অফিসারদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। গোয়েন্দারা যে সব নতুন সংবাদ সংগ্রহ করেছে সে সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। কি করে তার মোকাবেলা করা হবে তার প্ল্যান ও পরিকল্পনা নিয়ে বিবেচনা, পুন:বিবেচনা করা হচ্ছিল। ঠিক এই সময় পাহারার দায়িত্ব পড়লো এই রক্ষীর।

সর্প কেল্লার দরবেশের কাছ থেকে নতুন স্বপ্ন ও নতুন জগত দেখে এসেছে সে। সেই স্বপ্নে সে বিভোর।

অনেকক্ষণ পর।

উপদেষ্টা ও সামরিক অফিসারগণ কামরা থেকে বের হয়ে চলে গেলেন যার যার কাজে। সুলতান আইয়ুবী তখনো একাকী বসেছিলেন কামরায়। সিদ্ধান্তগুলো ঠিক হলো কিনা মনে মনে খতিয়ে দেখছিলেন তিনি। এমন সময় সে রক্ষী পা টিপে টিপে চুপিসারে প্রবেশ করলো কামরায়। সুলতান তখনো তন্ময় হয়ে ডুবেছিলেন আপন ভাবনায়।

সে সুলতানের একদম কাছাকাছি চলে এলো। সুলতানের কি মনে হলো, তিনি চট করে চাইলেন পিছন ফিরে। রক্ষী তাড়াতাড়ি তলোয়ার উঠিয়ে বলে উঠলো, 'তুমি আমার দাদার খুনী! আমার বাবার খুনী!'

সুলতান আইয়ুবী অবাক চোখে তাকিয়ে দেখলেন তাকে। সে বলতে লাগলো, 'তাকে তুমি মুক্ত করে দাও, ওই রাজকন্যা আমার।'

এই বলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়লো সুলতানের ওপর।

সুলতান আইয়ুবী নিরস্ত্র, তিনি তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে সরে পড়লেন একদিকে। রক্ষীর তলোয়ার সুলতানের কাঠের চেয়ারে সেঁধিয়ে গেল।

রক্ষী সেনা তলোয়ারটি মুক্ত করার জন্য টানাটানি করতে লাগলো। সুলতান দ্রুত এগিয়ে তার তলোয়ার পা দিয়ে চেপে ধরলেন।

ক্ষিপ্ত সিপাই এবার খঞ্জর বের করে আক্রমণ চালালো তাঁর ওপর। সুলতান ধরে ফেললেন তার হাত। সে হাত মুক্ত করার চেষ্টা করলো। কিন্তু আইয়ুবীর মত বীর যোদ্ধা ও দক্ষ সেনাপতির হাত থেকে মুক্ত হওয়া এত সহজ ছিল না।

সুলতান আইয়ুবী তার আঘাত ঠেকিয়ে অন্য গার্ডদের ডাক দিলেন। কামরায় ছুটে এলো গার্ডরা। সুলতান আইয়ুবী তাদের বললেন, 'খবরদার! ওর ওপর কেউ আঘাত করবে না। ওকে শুধু জীবিত বন্দী করো!'

রক্ষী তখনো সমানে চিৎকার করে বলছিল, 'তুমি আমার দাদার খুনী! আমার বাবার খুনী! আমার রাজ্য ও সিংহাসন জবর দখল করে রেখেছো! আমার স্বপ্নের রানীকে বন্দী করে রেখেছো!'

গার্ডরা তাকে ধরে ফেললো এবং তার কাছ থেকে খঞ্জর ও তলোয়ার কেড়ে নিলো।

'সাবাস রক্ষী! তুমি বেঁচে থাকো!' সুলতান আইয়ুবী রাগ না করে বরং তাকে ধন্যবাদ দিলেন। বললেন, 'মুসলিম সেনাবাহিনীতে তোমার মত এমন তেজস্বী যোদ্ধারই প্রয়োজন!'

কমাণ্ডার ও অন্যান্য বডিগার্ডরা সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে এ ওর দিকে তাকাতে লাগল! ঘটনা কি? যে রক্ষী সুলতানকে খুন করার জন্য আঘাত করলো তাকে সুলতন ধন্যবাদ দিচ্ছেন কিসের জন্য?

আইয়ুবী কমাণ্ডারকে বললেন, 'জলদি করে ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসো আর হাসান বিন আবদুল্লাহকে এখুনি আমার সাথে দেখা করতে বলো।'

চারজন বডিগার্ড সিপাইটিকে শক্ত করে ধরে রেখেছিলো। সে তখনো চিৎকার দিচ্ছিল, 'এই লোক আমার ভালবাসার খুনী! আমার ভাগ্যের খুনী!'

একজন বডিগার্ড তার মুখ বন্ধ করার জন্য মুখে হাত চাপা দিতে গেল, কিন্তু সুলতান আইয়ুবী তাকে নিষেধ করে

বললেন, 'ওকে বলতে দাও। হাত সরাও, দেখি ও কি বলে।' রক্ষীকে বললেন, 'বলো তো, তুমি কেন আমাকে হত্যা করতে চাও?'

'তুমি তাকে মুক্ত করে দাও!' রক্ষী চিৎকার করে বললো, 'তুমি তাকে খাঁচায় বন্দী করে রেখেছ। আমার ভালবাসাকে বন্দী করে রেখেছো। তুমি আমার দাদাকে খুন করেছো, আমার বাবাকে খুন করেছো, আমার রাজ্য ও সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করেছো আমাকে। হুজুর বলেছে, আমি তোমাকে হত্যা না করলে তুমিই আমাকে খুন করবে।'

সুলতান আইয়ুবী তাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। বডিগার্ডরা সুলতানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল আদেশের অপেক্ষায়। তাদের চোখগুলো বলছিল, 'একে কয়েদখানায় পাঠানোর নির্দেশ দিন। তার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য, সে আপনাকে খুন করতে চেয়েছিল। যদি আপনি সতর্ক না থাকতেন তবে মৃত্যু অবধারিত ছিল আপনার। আল্লাহর হাজার শোকর, আপনি সময় মত টের পেয়েছিলেন!'

কিন্তু আইয়ুবী তাকে কয়েকখানায় পাঠানোর আদেশ দিলেন না। রক্ষী উন্মাদের মত বকেই যাচ্ছিল।

ইতোমধ্যে ডাক্তার এসে গেলেন। তার একটু পরেই এলেন হাসান বিন আবদুল্লাহ। ভিতরের অবস্থা দেখে ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল।

'একে নিয়ে যাও, সম্ভবত: এই সিপাই পাগল হয়ে গেছে।' সুলতান আইয়ুবী বললেন।

'ও চারদিন ছুটি কাটিয়ে আজই মাত্র ডিউটিতে জয়েন্ট করেছে।' বডিগার্ডদের কমাণ্ডার বললো, 'যখন ডিউটিতে

এসেছে তখন থেকেই ও নিরব ছিল। কারো সাথে কোন কথা বলেনি।'

তাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তারও তার সাথে গেলেন।

সুলতান আইয়ুবী হাসান বিন আবদুল্লাহকে বললেন, 'চারদিন ছুটির পর আজ এসেই হঠাৎ ও আমাকে হত্যার জন্য আক্রমণ করার বিষয়টি রহস্যজনক।'

হাসান বিন আবদুল্লাহর মনে প্রথমেই যে সন্দেহ দানা বাঁধলো তিনি সুলতানকে তা জানালেন। বললেন, 'সে ফেদাইন গুপ্তঘাতক হতে পারে।'

সুলতান বললেন, এই সিপাহী মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। হঠাৎ করে কেন এমনটি ঘটলো ভাল করে তদন্ত করো। গত চারদিন ও কোথায় ছিল, কি করেছে এ সম্পর্কে ভাল মত তদন্ত করলেই আশা করি তার আসল পরিচয় বেরিয়ে যাবে।'

০

কিছুক্ষণ পর।

ডাক্তার ফিরে এলেন সুলতান আইয়ুবীর কাছে। বললেন, 'এ সৈনিককে গত কয়েকদিন ধরে পর্যায়ক্রমে নেশার মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল। তার উপরে সম্মোহন বিদ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে। সে যা করেছে সবই ঘোরের মধ্যে করেছে। কে বা কারা তাকে সম্মোহন করেছে তা উদ্ধার করা দরকার।'

ডাক্তার আরো বললেন, 'ডাক্তারী মতে এটা কোন আশ্চর্য ব্যাপার নয়। এর মূলে হাসান বিন সাবাহর ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। আপনি হয়তো জানেন, তারা এক প্রকার শরবত তৈরী করে, যে সেই শরবত পান করবে তার চোখের সামনে ভেসে উঠবে ভিন্নতর এক জগত। তখন তার কানে যে কথা বলা হবে, বাস্তবে সে তাই দেখতে পাবে। এর নাম কল্প-বাস্তবতা। ইচ্ছে করলেই তাকে নিয়ে যাওয়া যাবে সুন্দর ও স্বপ্নময় ভুবনে, আবার পরক্ষণেই ভয়ার্ত বিভীষিকার রাজ্যে ছুঁড়ে ফেলা যাবে তাকে। তার ওপর এ পদ্ধতিই প্রয়োগ করা হয়েছে।'

হাসান বিন সাবাহ-এর এ শরবতের কথা জানতেন সুলতান। সাবাহ সম্মোহন শাস্ত্রের অভাবিত উন্নতি সাধন করেছে। তৈরি করেছে বিস্ময়কর এক নতুন ভুবন । যে এই ভুবনে একবার প্রবেশ করে সে আর সেখান থেকে কিছুতেই বের হতে চায় না। তাকে মাটি ও পাথর খেতে দিয়ে যদি বলা হয়, ঘিয়ে পাকানো এক সুস্বাদু খাবার, সে তাই অনুভব করে। কাঁটার ওপর দিয়ে হাঁটার সময় যদি বলা হয়, সে মখমলের গালিচার ওপর হাঁটছে, তাও বিশ্বাস করবে সে।

ডাক্তার আরো বললেন, 'হাসান বিন সাবাহ মারা গেলেও তার শরবত ও সম্মোহন বিদ্যে মারা যায়নি, শিষ্যরা এখনো তার চর্চা অব্যাহত রেখেছে। সাধারণতঃ ফেদাইন গুপ্তঘাতকরাই এর চর্চা কারী। স্পর্শকাতর জায়গায় তারা নিজেরা না গিয়ে টোপ হিসাবে ব্যবহার করে সম্পূর্ণ নতুন লোক। তাকে প্রস্তুত করে এ শরবত ও সুন্দরী মেয়ে ব্যবহার করে। এ সৈনিক তেমনি চক্রান্তের শিকার। আপনাকে খুন করার জন্য প্রস্তুত করেই ওরা একে আপনার কাছে পাঠিয়েছে।'

ডাক্তার শরবতের প্রভাব থেকে সৈনিকটিকে মুক্ত করার জন্য ঔষধ দিলেন। ঔষধ খেয়ে সিপাইটি গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। হাসান বিন আবদুল্লাহ রোগীর অবস্থা ও এর কারণ সম্পর্কে ডাক্তারের মতামত জেনে বুঝতে পারলেন, তিনি যা সন্দেহ করেছিলেন ঘটনা প্রায় তাই। এটা ফেদাইনদেরই কাজ।
গত চারদিন এ সৈনিক ছুটিতে ছিলো। কিন্তু এ ছুটি সে কোথায় কাটিয়েছে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেল, কেউ এ সম্পর্কে কিছুই বলতে পারছে না। বিষয়টি নিয়ে তিনি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন।

শহরে সর্প কেল্লা সম্পর্কে নানা গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। এ গুজবের কিছু কিছু কথা হাসান বিন আবদুল্লাহর কানেও পৌঁছে ছিল।
লোকেরা বলাবলি করছিল, কেল্লার মধ্যে একজন বুজর্গ এসে আস্তানা গেড়েছেন। তিনি গায়েবের অবস্থা বলতে পারেন। মানুষের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে পারেন।
এতদিন হাসান বিন আবদুল্লাহ এদিকে মনোযোগ দেয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করেননি। কারণ, এমন বুজুর্গ ও পীরের আমদানি-রফতানি তো চলেই আসছে। পাগল জাতীয় লোককেও লোকেরা আল্লাহর মনোনীত লোক মনে করে। তার কাছে মনের আশা পূরণের দাবী জানায়। কিন্তু এ ঘটনার পর এ ব্যাপারে মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন তিনি।
হাসান বিন আবদুল্লাহর এক গোয়েন্দা জানালো, সে একজন কালো দাড়িওয়ালা লোককে কেল্লার মধ্যে দু'বার যেতে দেখেছে।

কেল্লার আশপাশের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেলো, কালো দাড়িওয়ালা, সাদা পোশাকের এক লোককে অনেকেই কেল্লার মধ্যে যাতায়াত করতে দেখেছে।
এসব তথ্য পাওয়ার পর হাসান বিন আবদুল্লাহ সূর্য ডোবার একটু আগে সৈন্যদের একটি দল নিয়ে হঠাৎ করেই সেখানে হানা দিল।
তখনো সন্ধ্যা হয়নি, কিন্তু কেল্লার ভেতর চাপ চাপ অন্ধকার। মশাল তাদের সঙ্গেই ছিল, মশাল জ্বেলে নিল তারা।
কেল্লার ভিতরে আঁকাবাকা সংকীর্ণ পথ। কোথাও কোথাও দেয়াল ধ্বসে পড়েছে। ইটের স্তুপ জমা হয়ে আছে রাস্তায়। তবে তার মধ্যেও কোন কোন কামরা দেখা গেল এখনো অক্ষত আছে।
সৈন্যরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। হঠাৎ এক দিক থেকে ভেসে এলো কারো চিৎকার ধ্বনি। কয়েকজন সিপাই দৌড়ে গেল সেদিকে। দেখলো দু'জন সৈন্য আহত হয়ে ছটফট করছে। তাদের বুকে বিঁধে আছে বিষাক্ত তীর।
ওরা ওখানে পৌঁছতেই আবারও কোত্থেকে তিন চারটা তীর ছুটে এলো। সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়লো আরো কয়েকজন। বাকীরা ভয়ে পিছু সরে এলো।
তাদের ধারনা ছিল, এখানে কোন মানুষ থাকতে পারে না। এখানে কেবল জ্বীন-ভূতের কারবার। ফলে কেউ কেউ খুব ঘাবড়ে গেল। ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল তাদের চোহারায়। কিন্তু যারা বাস্তববাদী তারা তাদের ভুল বুঝতে পারল।
হাসান বিন আবদুল্লাহ দুঃসাহসী ও বাস্তববাদী লোক ছিল। সে সৈন্যদের সাহস জোগানোর জন্য বললো, 'এ তীর মানুষের

নিক্ষিপ্ত।'

তিনি অবরোধের চিন্তা ত্যাগ করে সৈন্যদের একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। সৈন্যরা বিভিন্ন দিক থেকে সমবেত হওয়া শুরু করলে দেখা গেল অদৃশ্য স্থান থেকে একটি দুটি তীর ছুটে আসছে। এসব তীর আরো কয়েকজন সৈন্যকে আহত করে ফেললো।

কে বা কারা এই তীর ছুঁড়ছে, কোত্থেকে ছুঁড়ছে তার কোন হদিস খুঁজে পেল না ওরা। কেল্লার ভেতর কোন মানুষই নজরে পড়ল না ওদের।

হাসান বিন আবদুল্লাহ সবাইকে নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দিয়ে দু'জনকে ডেকে বললো, 'চুপিসারে বেরিয়ে যাও এখান থেকে। শহর থেকে আরও সৈন্য নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।'

রাত গভীর হয়ে এলো। সৈন্য নিয়ে ফিরে এলো পাঠানো দু'জন। ঘিরে ফেলা হলো সমগ্র কেল্লা। অসংখ্য মশাল জ্বলে উঠলো।

বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে দলে দলে কেল্লায় প্রবেশ করতে লাগলো ওরা। এক দল যেতে যেতে সেই কামরার কাছে পৌঁছে গেল, যেখানে দরবেশের সাথে দেখা করতো সেই রক্ষী সেনা।

এমন ভয়াবহ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এমন সাজানো গোছানো কামরা ও তার জৌলুসময় আসবাবপত্র দেখে কমাণ্ডারের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

হাসান বিন আবদুল্লাহকে সঙ্গে সঙ্গে জানানো হলো এ কামরার

কথা। সে ভেতরে প্রবেশ করে যে সব জিনিস দেখলো তাতে সুলতানকে হত্যা প্রচেষ্টার গোপন রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেলো তার কাছে।

ইতোমধ্যে কয়েকজন সৈন্য সেই কালো দাড়িওয়ালা হুজুরকে কোথা থেকে ধরে নিয়ে এলো। সঙ্গে সেই সুন্দরী মেয়েকেও। তল্লাশী চালিয়ে জঞ্জালের আড়াল থেকে উদ্ধার করা হলো আরো ছয়জনকে। তাদের কাছে ছিল তীর ধনুক।

সংসারত্যাগী কোন দরবেশের সাথে সুন্দরী মেয়ে, তীর ধনুক ও অস্ত্রশস্ত্র থাকার কথা নয়। ফলে সহজেই দরবেশের ধোকা ধরা পড়ে গেল। তার সমস্ত সরঞ্জাম ও বন্দীদের নিয়ে ফিরে চললেন হাসান বিন আবদুল্লাহ।

সেখান থেকে পাওয়া শরাবের পাত্রগুলো রাতেই ডাক্তারকে পৌঁছে দেয়া হলো পরীক্ষার জন্য। তিনি পাত্রের গন্ধ শুঁকেই বলে দিলেন, 'এরমধ্যে হাসান বিন সাব্বাহর বানানো সেই শরবত ছিল।'

হাসান বিন আবদুল্লাহ মুখোশধারী সেই দরবেশ, যুবতী ও অন্যান্য কয়েদীদের জেলে পাঠিয়ে দিয়ে রিপোর্ট করার জন্য চললেন সুলতার আইয়ুবীর কাছে।

o

সকালে সূর্য উঠার আগেই মেয়েটি শাস্তির ভয়ে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য উপহার দিল হাসান বিন আবদুল্লাহকে। স্বীকার করলো, তারা সবাই ফেদাইন গুপ্তঘাতক দলের সদস্য।

সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করার জন্য পাঠানো হয়েছে তাদের। তারা সবাই এই শপথ করে মিশনে শরীক হয়েছে যে, হয় তারা সুলতানকে হত্যা করে ঘরে ফিরবে নতুবা মৃত্যুকে কবুল করে নেবে। সুলতান আইয়ুবী বেঁচে থাকতে কারো ঘরে ফেরার অনুমতি নেই। কেউ এ শপথ ভঙ্গ করলে তাকে খুন করার জন্য কোন বিচারের সম্মুখীন করা হবে না তাকে।

মেয়েটি বললো, 'ঐ যুবককে সংগ্রহ করেছিল কালো দাড়িওয়ালা ব্যক্তি। তখন সে দরবেশের বেশে ছিল। তার কথা মতই যুবক সুর্প কেল্লায় যায়। সেখানে তাকে নেশা পান করানোর দায়িত্ব ছিল আমার ওপর আর তাকে সম্মোহন করার দায়িত্ব ছিল দরবেশধারীর।

সম্মোহনের মাধ্যমে সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হয় যুবককে। সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করার মানসিক প্রস্তুতি তৈরী হওয়ার পরই ওকে ফেরত পাঠানো হয়।

আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, সুলতান আইয়ুবীকে সে সহজেই খুন করতে পারবে। সেই খুশীতেই আমরা শান্ত মনে কেল্লায় বসেছিলাম।'

হাসানের প্রশ্নের জবাবে মেয়েটি আরো জানালো, 'তার সাফল্যের সংবাদ নেয়ার জন্য বাইরে আমাদের লোক ছিল। সুলতান খুন হওয়ার সাথে সাথেই সে খবর আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব ছিল তাদের ওপর। কিন্তু তারা ফিরে যাওয়ার আগেই সন্ধ্যার সময় হঠাৎ সৈন্যদল কেল্লায় ঢুকে পড়ায় আমরা বিপাকে পড়ে যাই। সৈন্যদের খুন করে বা ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয়ার জন্যই তাদের ওপর তীর ছোঁড়া হয়েছিল।'

কালো দাড়িওয়ালা ছিল কঠিন প্রাণের লোক। সে মেয়েটির সাথে তার সব সম্পর্ক অস্বীকার করলো। বললো, 'একমাত্র নিরিবিলিতে আল্লাহর নাম জপ করার জন্যই আমি এ কেল্লাকে বেছে নিয়েছিলাম। অন্য কারো সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের সাথে কেল্লায় কখনো আমার দেখাও হয়নি।'

অন্যান্য বন্দীরাও যার যার মত নিজেদের নির্দোষ দাবী করলো এবং তাদের বিরুদ্ধে সব অভিযোগ অস্বীকার করলো। প্রত্যেকেই এ জন্য নতুন নতুন গল্প শোনাল জেরাকারীদের।

কিন্তু হাসান বিন আর্বদুল্লাহ যখন বন্দীদের কাছ থেকে তথ্য আদায় করার গোপন কক্ষে নিয়ে গেলো তাদের, তখন প্রত্যেকে একের পর এক তাদের সব অপরাধ স্বীকার করে নিল।

কালো দাড়িওয়ালাকে যখন তাদের সামনে নিয়ে দাঁড় করানো হলো, তখন তার আর অস্বীকার করার কোনই সুযোগ থাকলো না। সে সাথীদের করুণ অবস্থা দেখে কেঁপে উঠল।

তাঁকে বলা হলো, 'যদি তুমি এখনো সবিস্তারে সব কথা খুলে বলো এবং নিজের অপরাধ স্বীকার করো তবে তোমার ওপর কোন নির্যাতন করা হবে না। আর যদি অস্বীকার করো তবে বন্দীদের কাছ থেকে কথা আদায় করার জন্য যে সব শাস্তি আজ পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয়েছে একে একে তার সবই তোমার ওপর প্রয়োগ করা হবে। তুমি বাঁচতেও পারবে না, মরতেও পারবে না। আমি এক থেকে দশ পর্যন্ত গুণবো, এর মধ্যে মুখ না খুললে তোমার সাথে আর ঠোঁটের ভাষায় কথা বলা হবে না।'

হাসান বিন আবদুল্লাহ গোণা শুরু করলো, 'এক, দুই, তিন...'

লোকটি তাকালো তার সঙ্গীদের দিকে। তাদের করুণ ও ভয়ার্ত

চেহারার দিকে শেষ বারের মত তাকিয়ে দশ বলার আগেই সে চিৎকার করে উঠল, 'বলবো, আমি সব বলবো।'

সে স্বীকার করলো, সে ফেদাইন খুনী চক্রের লোক। ফেদাইন নেতা শেখ মান্নানের সে বিশেষ প্রিয়ভাজন ও পরীক্ষিত খুনী। কিন্তু সে নিজ হাতে খুন করে না, সম্মোহনের মাধ্যমে সে নতুন নতুন খুনী তৈরী করে এবং তাদের দিয়ে কাংখিত খুনের ঘটনা ঘটায়।

হাসান বিন সাবাহর আবিষ্কৃত এই অভিনব খুনের পদ্ধতি অতীতে বহুবার ফলপ্রসু ভূমিকা রেখেছে। অসাধারণ বুদ্ধি ও কুটচালে সিদ্ধহস্ত ছিল সে। কিন্তু সে তার মেধা ও জ্ঞানকে ব্যবহার করতো শয়তানী কাজে।

সুলতান আইয়ুবীকে হত্যার জন্য রক্ষী সেনাকে উস্কে দেয়ার এ কৌশল তারই আবিস্কৃত। এ পদ্ধতি কতটা কার্যকর ছিল তা সুলতানের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ এক রক্ষীর সুলতানকে হত্যার প্রচেষ্টা থেকেই স্পষ্ট বুঝা যায়।

মানুষের মন নিয়ে সে প্রচুর গবেষণা করেছে। মানুষ কেবল নিজের মনই নিয়ন্ত্রণ করে না, অন্যের মন নিয়ন্ত্রণেও আশ্চর্য দক্ষতা দেখাতে পারে, এটাই ছিল তার দাবী। সে দাবীর প্রমাণ স্বরূপই সে আবিস্কার করে অভিনব পদ্ধতি। যে পদ্ধতি প্রয়োগ করে এক সামান্য সিপাইকে ফেদাইনরা দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল সুলতান আইয়ুবীর মত জাদরেল সেনানায়কের বিরুদ্ধে।

কালো দাড়িওয়ালা বললো, 'আইয়ুবীকে হত্যার উদ্দেশ্যে চারবার আমাদের আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত আমরা এ পদ্ধতি ব্যবহারে বাধ্য হই। আগের চারটি আক্রমণই ব্যর্থ হওয়ায় আমরা স্পষ্ট বুঝেছিলাম, সোজা পথে সুলতান

আইয়ুবীকে হত্যা করা সম্ভব নয়। তাই দলের ছয়জন দক্ষ ও সাহসী সঙ্গী ও একটি মেয়েকে নিয়ে দামেশকে চলে আসি। আস্তানা গাড়ি সর্প কেল্লায়।
রাতের বেলা আমরা এই সাপের কেল্লায় প্রবেশ করি। সমস্ত আসবাবপত্রও নিয়ে আসি রাতের আঁধারে। আমার লোকেরাই শহরে গুজব ছড়িয়ে দেয়, কেল্লায় এক দরবেশ এসেছেন, যার হাতে অদৃশ্য শক্তি আছে। যিনি মানুষের ভুত-ভবিষ্যত সবই বলে দিতে পারেন।
এই গুজবের উদ্দেশ্য ছিলো, লোকজন যেন কেল্লার মধ্যে আসে। কেউ এলেই তার সামনে নিজেকে দরবেশ হিসেবে পরিচয় দিয়ে যেন ওদের ভক্তি শ্রদ্ধা আদায় করে নিতে পারি। তারপর সুযোগ বুঝে এক বা একাধিক লোককে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে সুলতান আইয়ুবীকে হত্যার জন্য পাঠিয়ে দেবো। কিন্তু এ আশা সফল হলো না, লোকেরা কেল্লার কাছে কেউ এলো না। কেল্লা সম্পর্কে জনমনে যে ভীতি ছিল, বিশেষ করে হাজার বছর বয়সী দুই সাপের যে কাহিনী প্রচলিত ছিল, সেই ভয় কাটিয়ে কেউ এলো না কেল্লায়।
তখনি আমার মাথায় এলো, সুলতান আইয়ুবীর কোন সৈন্যকে কৌশলে ব্যবহার করার চিন্তা। আমি তখন সুলতান আইয়ুবীর রক্ষী দলের খোঁজ-খবর নিতে থাকি। তারা কোথায় থাকে, কিভাবে তাদের ডিউটি বদল হয়, এসব জানার পর ওই বডিগার্ডকে হাতের কাছে পেয়ে যাই।
অবশ্য, সুলতান আইয়ুবীর অফিস বা মহল কোথাও যাওয়ার সুযোগ আমার হয়নি। ঐ বডিগার্ডকে পেয়ে সেখানে যাওয়ার আর প্রয়োজনও বোধ করিনি। কারণ তাকে দিয়েই সুলতান

পর্যন্ত আমি বিনা বাঁধায় পৌছে যেতে পারবো।

একদিন পথে তার সাথে দেখা হওয়ার পর এমন সব কথা বললাম, যে কথায় যত বড় দৃঢ় চিত্তের লোকই হোক না কেন, প্রভাবিত না হয়ে পারে না। কাউকে প্রভাবিত করার জন্য যে ভাষা, ভঙ্গি ও অভিনয় দরকার সবই আমার জানা ছিল। আমি সহজেই যুবককে জালে আটকে ফেললাম এবং রাতে তাকে কেল্লার মধ্যে আসতে বললাম।

কেল্লায় এমন ব্যবস্থা রাখা ছিল, যেখানে পাথরকেও মোম বানানো যায়। বিশেষ করে সুন্দরী নারীর ছলাকলা যাদুর চেয়েও বেশী প্রভাব বিস্তার করে কোন যুবকের মনে। এই অস্ত্রও প্রয়োগ করা হয় তার ওপর। এক মেয়ের রেশমী কোমল চুলের বাঁধনে আটকা পড়ে যুবক।

তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় স্বপ্নময় রহস্যের জগতে। তার মাথায় এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করা হয় যে, সে শাহী পরিবারের সন্তান। আর তার পরিবার ও বংশ শাহ সোলায়মানের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। তাকে এক সুন্দর রহস্যময় রূপকথার গল্প শোনানো হয়।

মেয়েটির পান করানো শরবতের নেশার ঘোরে তার ওপর চালানো হয় সম্মোহন, আইয়ুবীকে খুন করার জন্য উন্মাদ হয়ে যায় সে।

চারদিন ও চার রাতের অনবরত নেশা ও সম্মোহনের পর সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে খুন করার জন্য তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয় তার ডিউটিতে।

রক্ষী সেনা বেহুশ অবস্থায় পড়েছিল। তার দেহ-মন থেকে নেশার ঘোর তখনো কাটেনি। সে কল্পনার জগতেই ভেসে বেড়াচ্ছিল।

ডাক্তার তাকে সজ্ঞানে আনবার সব রকম প্রচেষ্টা চালাতে লাগলেন। দুদিন পরে সিপাহী চোখ খুললো। সে এমন ভাবে ঘুম থেকে উঠলো, যেন সে স্বপ্ন দেখছিল।

সে আশপাশের লোকজনকে বিস্মিত হয়ে দেখতে লাগলো। ডাক্তার তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

সে বললো, 'শুয়েছি াম।'

অনেকক্ষণ পর সে যখন স্বাভাবিক অবস্থায় আসলো তখন তাকে তার স্বপ্নময় জগতের কথা জিজ্ঞেস করা হলো। সে কিছুই বলতে পারল না। সে শুধু বললো, 'কালো দাড়িওয়ালা এক লোক আমাকে কেল্লার মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল।' সেখানকার কিছু কথাও সে বললো, কিন্তু তার সবটা খেয়ালে আসছিল না।

তাকে যখন বলা হলো, 'তুমি সুলতান আইয়ুবীকে আক্রমণ করেছিলে কেন' তখন সে বিস্মিত ও লজ্জিত হয়ে বললো, 'যাহ্, আমার সাথে এমন ঠাট্টা করবেন না।'

তাকে এ কথা বিশ্বাস করানোর জন্য সুলতান আইয়ুবীর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। সে ফৌজি কায়দায় সুলতানকে সালাম করলো। সুলতান আইয়ুবী স্নেহময় কোমল স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এখন কেমন আছো?'

সে সুলতানের ব্যবহার এবং সঙ্গীদের কাণ্ডকারখানা দেখে যারপরনাই বিস্মিত হয়ে বললো, 'এই, এসব কি হচ্ছে!'
যখন তাকে সব ঘটনা খুলে বলা হলো তখন সে চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা! বলুন, এসব কথা সত্যি নয়! আমি সুলতান আইয়ুবীর ওপর আক্রমণ করতে পারি না। বিশ্বাস করুন, কিছুতেই না।'
সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'এই সিপাহী নিরপরাধ, তাকে কখনো কেউ এ নিয়ে কিছু বলবে না। আমি যেন শুনতে না পাই, এ নিয়ে তোমরা তাকে কখনো লজ্জায় ফেলেছো।'

০

হত্যার এই পদ্ধতি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সামরিক অফিসারদের বেশ ভাবিয়ে তুললো। সুলতান আইয়ুবীর জন্য জীবন উৎসর্গকারী এক দেহরক্ষীর মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে নেশা ও সম্মোহনের মাধ্যমে সুলতানের ওপরই আক্রমণ চালানোর জন্য প্রস্তুত করার ভয়ানক খেলা যারা খেলতে পারে, তারা কত ভয়ংকর, নিষ্ঠুর ও বেপরোয়া বুঝতে কষ্ট হয় না কারো। আল্লাহর রহমত আছে বলেই সুলতান অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন! তাদের পরবর্তী আক্রমণ কোন দিক থেকে আসবে তাই নিয়ে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই অফিসারদের।

•

এই ঘটনার কয়েক দিন পর।
সুলতান আইয়ুবী দামেশকের প্রতিরক্ষা কর্তকর্তা ও সামরিক

অফিসারদের এক সম্মেলন ডাকেন।

এরা সবাই ক্ষিপ্ত ছিল খলিফা আস সালেহ ও তাঁর আমীর উজিরদের ওপর। কারণ তারাই সুলতান আইয়ুবীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছিল। ফেদাইন গ্রুপকে তারাই ভাড়া করেছিল গুপ্তহত্যার জন্য।

সকলেই ভেবেছিলেন, সুলতান এ ব্যাপারেই সম্মেলন ডেকেছেন। কিন্তু সুলতান আইয়ুবী সে বিষয়ে কোন আলোচনাই করলেন না। যেন তাঁর এ ব্যাপারে কোন চিন্তাই নেই।

তখন পর্যন্ত গোয়েন্দা বিভাগ শত্রুদের তৎপরতার যে সব সংবাদ দিচ্ছিল তিনি সে সম্পর্কে সম্মেলনে তাঁর প্ল্যান পরিকল্পনার বিষয় সকলকে জ্ঞাত করালেন। তাঁর পরিকল্পনা ও তৎপরতার মধ্যে কোন উত্তেজনার আভাসও ছিল না।

যখন তিনি ভাষণ শেষ করলেন তখন সকলেই উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো, 'আপনার ওপর যে হত্যা প্রচেষ্টা হলো, এ ব্যাপারে আপনি কি পদক্ষেপের কথা চিন্তা করছেন তা তো কিছুই বললেন না? এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে চাই আমরা।'

সুলতান আইয়ুবী হাসি মুখে বললেন, 'রাগ, উত্তেজনা ও আবেগের বশবর্তী হয়ে কখনো কোন কিছু করবেন না। শত্রুরা আপনাদেরকে উত্তেজিত করে এমন কিছু করতে বাধ্য করতে চায়, যাতে জ্ঞান বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে রাগ ও আবেগের বশে চলতে গিয়ে আপনারা ভুল করে বসেন।

আমার সমস্ত পরিকল্পনা ও তৎপরতাই ওদের অশুভ তৎপরতা মোকাবেলার লক্ষ্যে। কোন ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপার এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় স্বার্থ থেকে আমার

দৃষ্টিকে অন্য দিকে ফেরাতে চাই না।
ওদের সাথে আমাদের সংঘাত জাতীয় স্বার্থের কারণে। আমার জীবন, আমার স্বত্ত্বা এবং তোমাদের প্রত্যেকের জীবন ও সত্ত্বা, সবকিছুই ইসলাম ও মুসলিম জাতিসত্ত্বা রক্ষার জন্য। এর জন্য আমরা সকলেই জীবন কোরবানী করার শপথ নিয়েছি। যুদ্ধের ময়দানে মারা যাই বা শত্রুর ষড়যন্ত্রে মৃত্যুবরণ করি, দুই অবস্থায়ই আমাদের মৃত্যু হবে শাহাদাতের।
শাসক ও মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, শাসকগোষ্ঠী শুধু তার সরকার রক্ষা ও তার ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরক্ষণের কথা চিন্তা করে। আর মুজাহিদ তার দেশ ও জাতির জন্য জীবন কোরবান করে।
আস সালেহ ও তাঁর আমীর-উজিররা তাদের বাদশাহী ও ক্ষমতা রক্ষা করতে চায়। এই নিয়ম আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী, অতএব তারা পরাজিত হতে বাধ্য। কোন ছোটখাট বিষয় নিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে সময় ও শক্তি অপচয় করার সুযোগ নেই আমাদের। তাদের সার্বিক ও চূড়ান্ত পরাজয়ই আমাদের সকল তৎপরতার লক্ষ্য।'
সুলতান আইয়ুবী তাঁর গোয়েন্দা বাহিনীর শাখা প্রধান হাসান বিন আবদুল্লাহকে বললেন, 'এমন বেওয়ারিশ পুরাতন দালান কোঠার ধ্বংসাবশেষ যেখানে আছে, যার কোন প্রয়োজন নেই, সেগুলো মাটির সাথে মিশিয়ে দাও।'
তিনি আরও নির্দেশ দিলেন, 'মসজিদে শুধু এমন খোৎবা দান করা হবে, যার বিষয় হবে আল্লাহতায়ালা ইহকাল ও পরকালের মালিক। আর অদৃশ্যের খবর একমাত্র তিনি ছাড়া কেউ জানেন না। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য আল্লাহ ও তাঁর বান্দার

মাঝখানে কোন দালালের সুপারিশের প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ সকল বান্দার আবেদনই শোনেন। এমনকি বান্দারা যা প্রকাশ না করে গোপন রাখে, আল্লাহ তাও জানতে পারেন। তাই কোন লোকের সামনে নত হওয়া, তাকে সিজদা করা শুধু নাজায়েজই নয়, সম্পূর্ণ হারাম ও গুণাহের কাজ।

মুসলমানদের দায়িত্ব হচ্ছে, মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে উদ্ধার করা, ব্যক্তিপূজা থেকে মানুষকে রক্ষা করা।

আমার এ কথার মানে এ নয় যে, তোমরা ধর্মীয় নেতাদের শ্রদ্ধা করবে না, আলেম ওলামাদের ভক্তি করবে না। মুরুব্বীদের অবশ্যই শ্রদ্ধা করবে, আলেম ও নেতৃবৃন্দকে ভক্তি করবে, তবে তা সর্বাবস্থায় শরীয়তের সীমার মধ্য থেকে হতে হবে।'

তিনি আরও বললেন, 'তোমরা সৈন্যদের এই উপদেশই দাও, যেভাবে তারা যুদ্ধের ময়দানে নিজেদের দেহ শত্রুর অস্ত্রের আঘাত থেকে বাঁচায়, প্রতিরোধ করে, তেমনিভাবে নিজের অন্তর এবং বিবেককেও শত্রুদের অপপ্রচার ও মতবাদের অস্ত্র থেকে রক্ষা করো। এ আঘাত তলোয়ারের আঘাত নয়, কথার আঘাত। শরীরের আঘাত মিলিয়ে যায়, আহত শরীর নিয়েও যুদ্ধ করা যায়, কিন্তু মন ও চিন্তায় যদি আঘাত লাগে, তবে শরীর অকেজো হয়ে যায়।

তোমরা নেশার প্রভাব দেখতে পেয়েছ, কেমন ভাবে আমার দেহরক্ষীই আমার ওপর আক্রমণ করেছিল। কিন্তু যখন নেশার ঘোর কেটে গেল তখন সে নিজেও বিশ্বাস করতে পারলো না, সত্যি সে আমাকে আঘাত করেছে।

মন এমনি এক জিনিস, একে পবিত্র না রাখলে কোন কিছুই

আর পবিত্র থাকে না। যখন শত্রুর কথার তীর তোমার মনকে তার বশীভূত করে নেবে তখন তোমার মূল সম্পদ ঈমানের ঘরই ফাঁকা হয়ে যাবে।

এ জন্যই সশস্ত্র লড়াইয়ের চাইতে সাংস্কৃতিক লড়াই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সশস্ত্র লড়াইয়ের সৈনিক হিসাবে তোমাদের এ কথা সর্বক্ষণ মনে রাখতে হবে, অস্ত্র লড়াই করে না, লড়াই করে জিন্দাদীল মুজাহিদ, অস্ত্র তার হাতিয়ার। যদি তোমার মধ্যে লড়াই করার সদিচ্ছা ও আগ্রহ শেষ হয়ে যায়, তবে অস্ত্রের মজুত কোনদিন তোমাকে বিজয় এনে দেবে না। ঈমানকে সর্বক্ষণ সতেজ ও সজীব রাখার জন্য সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অপরিহার্য।

প্রতিপক্ষ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালায় মেয়েদের দিয়ে। তোমরা জেনেছো, এই নেশা ওরা প্রয়োগ করেছিল একটি সুন্দরী মেয়ের সাহায্যে। এই মেয়েদেরকেও ওরা নেশার সামগ্রী বানিয়ে নিয়েছে। ওরা এই মেয়েদের দিয়ে নেশায় নেশায় নেশাময় ভুবন তৈরীর চেষ্টা করবে, আর তোমাদের কাজ হবে এই নেশার জগত থেকে মুক্ত থাকা, জাতিকে এ নেশার ভুবন থেকে সরিয়ে আনা।

এ কথাও মনে রেখো, এই নেশা ওরা এ জন্যই ছড়াতে চায়, যাতে তোমাদেরকে গোলাম বানাতে পারে, ভেঁড়ার পালের মত তাড়িয়ে বেড়াতে পারে ইচ্ছে মত।

বাঁচতে চাইলে তোমরা তোমাদের দায়িত্বের অনুভূতি তীক্ষ্ণ করো, মুসলমানদের জাতীয় চেতনাবোধ ও শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি জাগ্রত করো। আমি বার বার তোমাদের বলি, তোমরা আল্লাহর খলিফা, তাঁর প্রতিনিধি– এ কথা কখনো ভুলে যেয়ো না। সমগ্র

বিশ্ব মানবতার ভালমন্দ দেখার দায়িত্ব, আল্লাহর তামাম সৃষ্টির মঙ্গল ও কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব তোমাদের।

এত বড় সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ তায়ালা অন্য কোন প্রাণী, অন্য কোন জাতিকে দান করেননি। কোন অর্বাচীন, অবিবেচক ও অসতর্ক ব্যক্তি এই মর্যাদা টিকিয়ে রাখতে পারে না। এর জন্য চাই কঠিন দায়িত্ববোধ, চাই জাতীয় সম্মান রক্ষার সুকঠিন অঙ্গীকার।

উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতিটি সদস্যের মধ্যে এই চেতনাবোধ, এই দায়িত্বানুভূতি তাদের ঈমানের সাথে সংযুক্ত করে দাও। তাহলে আর কোন নেশা ওদের ওপর চেপে বসতে পারবে না। বিষে বিষ ক্ষয় হয়। সাংস্কৃতিক হামলার মোকাবেলায় সাংস্কৃতিক তৎপরতা বাড়াও। আল্লাহ প্রেমের নেশা জাগাও অন্তরে। তার সৃষ্টি-সেবার মধ্য দিয়ে বিকশিত করো সে প্রেম। এসব তুচ্ছ নেশা তখন তোমাদের স্পর্শ করতেও ভয় পাবে।'

সুলতান আইয়ুবী আক্রমণের যে প্ল্যান-পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন, সে অনুসারে দূর্গের পরে দূর্গ জয় করে অগ্রসর হওয়ার জন্য তৈরী হলো মুজাহিদ বাহিনী। মজবুত ও বিখ্যাত কেল্লা হিসেবে হেমস, হলব ও হেমাতের সুনাম ছিল। তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল সুদৃঢ়। কেল্লাগুলোও ছিল শহর থেকে দূরে।

আরও কিছু দূর্গ ছিল পাহাড়ী ও দূর্গম এলাকায়। এই প্রচণ্ড শীতে যে এলাকায় অভিযান পরিচালনার কথা কেউ চিন্তাও করতে পারে না।

পাহাড়ের উপরে বরফের পুরো আস্তর পড়েছিল। হিমেল

বাতাসে মৃত্যুর হাতছানি। কেল্লার ভেতর শত্রু সেনারা উষ্ণ আরামে বিভোর। তারা জানে, এ সময় মানুষ তো দূরের কথা, কোন পাখিও ডানা মেলবে না আকাশে, প্রাণীরা পা ফেলবে না রাস্তার হীম-শীতলতায়। তাই তারা নিরুদ্বিগ্ন, দুশ্চিন্তাহীন।
তাদের খৃস্টান উপদেষ্টারাও তাদের উপদেশ দিয়েছে, 'শীতকালটা পার করো যুদ্ধের পরিকল্পনা ছাড়াই। শীত গেলে আইয়ুবীর বিরুদ্ধে আমরা এক যোগে ঝাঁপিয়ে পড়বো। নাস্তানাবুদ করে দেবো তার যুদ্ধবাজ বাহিনীকে।'
এদিকে সুলতান আইয়ুবীর অটুট পণ, শীতকালেই যুদ্ধ করবেন তিনি। কারণ গোয়েন্দারা তাঁকে যে সংবাদ সরবরাহ করেছে তাতে এটাই যুদ্ধ যাত্রার মোক্ষম সময়।

একদিন এক সংবাদদাতা খবর দিল, 'হলবের মসজিদের ইমামগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন তাদের খোৎবায় সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সাম্রাজ্য লিপ্সার কাহিনী প্রচার করে। তিনি পাপী, গোনাহগার, ক্ষমতা লোভী। তিনি অহংকারী এবং ইসলামী খেলাফতের দুশমন। খলিফার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়ে সে মুরতাদ হয়ে গেছে। মুরতাদের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড।
অতএব আইয়ুবীকে হত্যা করে ইসলামী খেলাফতকে রক্ষা করা এখন ফরজ। যারা সরাসরি এ জেহাদে শরীক হতে পারবে না, তারা যেন এ জেহাদকে সাহায্য সহযোগিতা দেয়। যাদের এ সামর্থও নেই তারা যেন এ জেহাদের সাফল্যের জন্য দোয়া করে। যারা এটাও করবে না, তারা মুসলমান থাকবে না।'

খোৎবায় তারা যেন আরও বলে, 'সুলতান আইয়ুবী বিলাসপরায়ণ, চরিত্রহীন।' তাদের আরও বলা হয়েছে, 'যদি খোৎবায় খলিফার নাম না নেয়া হয় তবে সে খোৎবা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আর অসম্পূর্ণ খোৎবা দেয়া যেমন পাপের কাজ, শোনাও তেমন পাপ।'

সরাইখানা, যাত্রী ছাউনী এমনকি হাটে-বাজারেও এ ধরনের কথা প্রচার করা হচ্ছে। 'সুলতান আইয়ুবী বিলাসপরায়ণ, চরিত্রহীন, ক্ষমতালিপ্সু। সুলতান আইয়ুবী কাফের।'

সংবাদদাতা আরও বললো, 'এই সাথে জনমনে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করা হচ্ছে।'

খলিফা আস সালেহের সৈন্য সংখ্যা অল্প ছিল, কারণ তার অর্ধেকের বেশী সৈন্য সেনাপতি তাওফিক জাওয়াদের নেতৃত্বে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং আস সালেহের স্বার্থপর আমীর ও উজিররা জনগণকে যুদ্ধের জন্য উস্কানি দিতে লাগলো।

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে খৃস্টানদের কার্যকরী সহায়তা পেল ওরা। খৃস্টানদের সহযোগিতা আদায়ের জন্য যেসব এলাকায় খৃস্টান বাসিন্দা বেশী ছিল সেখান থেকে হলব, মুশাল ও বিভিন্ন পল্লী এলাকায় তাদেরকে পুনর্বাসন করা হলো। সেই সাথে তাদের নির্দেশ দেয়া হলো, তারা যেন সেই এলাকার লোকদের মাঝে সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে উস্কানী ও মিথ্যা প্রচারনা চালায়।

গোয়েন্দাদের রিপোর্টে থেকে আরো জানা গেল, হলবের নাগরিকদেরকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। হলববাসী সবার

মুখেই এখন অস্ত্রের ভাষা। যুদ্ধের উন্মাদনার সাথে সাথে জনগণের মধ্যে অস্থিরতা এবং ভীতির ভাবও ছড়িয়ে পড়লো। ফলে স্থানীয় মুসলমানদের মন দুশ্চিন্তা এবং ভীতিতে ছেয়ে গেল। তারা বলাবলি করছিল, 'মুসলমান আপোষে ভাই ভাই যুদ্ধ করবে, এটা কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ।'

কিন্তু তাদের কথা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রচারণার অন্তরালে হারিয়ে যাচ্ছিল। কারণ, এসব কথা খৃস্টানদের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী ছিল।

মুসলমান মুসলমান আপোষে যুদ্ধ করা পাপ এ কথা বলায় কয়েকটা মসজিদ থেকে আগের ইমাম ও খতিবকে বহিষ্কার করা হলো।

ত্রিপোলীর খৃস্টান শাসক রিমাণ্ড প্রচুর ধনরত্ন ও অর্থসম্পদ নিয়ে আস সালেহকে সহযোগিতা করার জন্য যেসব উপদেষ্টা পাঠিয়েছিল তাদের পরামর্শেই পরিচালিত হচ্ছিল এসব তৎপরতা।

এসব উপদেষ্টার মধ্যে গোয়েন্দা বাহিনীর অভিজ্ঞ অফিসার যেমন ছিল তেমনি ছিল সন্ত্রাসী গ্রুপের লোকও। এই উপদেষ্টারা হলবে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে খৃস্ট-মুসলিম সম্মিলিত বাহিনীর কমাণ্ডিং দায়িত্ব অর্পণ করা হলো।

দু'দিন পর। আরেক গোয়েন্দা এসে হাসান বিন আবদুল্লাহকে খবর দিল, 'খৃস্টান ষড়যন্ত্রকারীরা সুলতানের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা শুরু করেছে। এতে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ছে মুসলমানদের মধ্যে। বিভিন্ন মসজিদে সুলতানের বিরুদ্ধে খুতবা দেয়া হচ্ছে। তাতে সুলতানকে কাফের, মুরতাদ ও

ক্ষমতালিপ্সু বলে প্রচার করা হচ্ছে। যে সব মসজিদের ইমামরা এ ধরনের খুতবাদানে বিরত রয়েছে তাদেরকে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে ইমামতি থেকে।'

সে আরো জানালো, 'হলবের এক মসজিদের ইমাম তার খুতবায় ভিন্ন রকম বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি সমবেত মুসুল্লিদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'ভাইসব, জাতির সামনে এক সংকটময় সময় উপস্থিত। একদিকে খলিফা আইয়ুবীর বিরুদ্ধে জেহাদে শামিল হওয়ার জন্য আহবান জানাচ্ছেন, অন্যদিকে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী প্রস্তুতি নিচ্ছেন লড়াইয়ের। দু'দলই আজ মুখোমুখি এবং দু'দলই দাবী করছে ইসলামের স্বার্থে আমরা যেন তাদের সহযোগিতা করি।

ফলে কে যে আসলে ইসলামের স্বপক্ষে এ নিয়ে জনমনে সৃষ্টি হয়েছে বিভ্রান্তি। আমরা অবশ্যই ইসলামের স্বপক্ষ শক্তিকে সহায়তা করতে চাই এবং তা করা আমাদের ঈমানের দাবী। কিন্তু আমরা কার পক্ষ নেবো? কে ইসলামের জন্য অস্ত্র ধরেছেন? খলিফা বা সুলতান এদের একজন ইসলামের পক্ষে হলে অন্যজন অবশ্যই ইসলামের শত্রু। কিন্তু কে সে?

প্রিয় মুসুল্লি ভাইয়েরা আমার! যদি দু'দল মুসলমান একে অন্যের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত হয়, তবে শরিয়ত অনুযায়ী মুসলমানদের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের বিরোধ মিটিয়ে দেয়া। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন কোন অভিভাবক নেই, যার কথা ওরা শুনবে। এখন সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে অভিভাবকরা, ফলে শালিসের কোন অবকাশ নেই এখানে। সংঘাত অনিবার্য। তাই, কে ইসলামের স্বপক্ষে আর কে নয়, তা নির্ধারণ করা আজ জরুরী হয়ে পড়েছে।

ভাইসব, বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামের ঝাণ্ডার নিচে সমবেত হতে হবে আমাদের। এই বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে, যদি দেখেন দু'দল মুসলমানই ইসলামের জন্য লড়াই করছে বলে দাবী করে, তবে তাদের মধ্যে সেই দলই ইসলামের স্বপক্ষে, ইসলাম বিরোধী শক্তির সাথে যাদের কোন আঁতাত নেই। যারা নিজেদের বিজয়ের জন্য অমুসলমানের কাছে সাহায্যের জন্য হাত বাড়ায় না। যদি দেখেন, অমুসলমানরা কোন পক্ষকে অস্ত্র দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, সৈন্য বা জনবল দিয়ে সাহায্য করছে, তবে তারা যতই নামাজ রোজার পাবন্দী হোক, লেবাসে-সুরতে পরহেজগারী দেখাক, তারা ইসলামের শত্রু।

ইসলাম বিরোধী শক্তি ইসলামের বিনাশ সাধনের জন্য সব সময় মুসলমানদের মধ্য থেকে এমন একদল লোককে কিনে নিতে চায়, ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিতদের বিরুদ্ধে যাদের কাজে লাগানো যায়। কেউ না বুঝে, কেউ লোভ-লালসায় পড়ে তাদের সহযোগী হলে তাদেরকে তারা সেই সংগ্রামী কাফেলার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়। মিথ্যা ফতোয়া দেয়া, অহেতুক অপবাদ দেয়া ও নানা রকম বিভ্রান্তি ছড়িয়ে ইসলামী শক্তির অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দেয়ার কাজে কাফেরদের সরাসরি হস্তক্ষেপের চাইতেও এ পদ্ধতি বেশী কার্যকরী হয় বলে দুশমন এ ব্যাপারে খুবই আগ্রহী থাকে।

আপনারা জানেন, ইসলামী খেলাফতের হকদার সেই, যিনি আমাদের মাঝে জ্ঞানে, যোগ্যতায়, বিচক্ষণতায়, দুরদর্শিতায়, ঈমানী শক্তি ও আমলে সবচে প্রবল। ইসলামে রাজতন্ত্র নেই, তাহলে মরহুম জঙ্গীর নাবালক সন্তান কি করে খেলাফতের

দাবীদার হয়? তাকে সহায়তা দানের জন্য তার দরবারে এখন খৃস্টান উপদেষ্টারা সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকে কিসের জন্য? কেন খৃস্টান শাসক রিমাণ্ড তার সাথে সামরিক সহযোগিতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়? অতএব এটা পরিষ্কার, খলিফার বাহিনী ইসলাম বিরোধী শিবিরে অবস্থান নিয়েছে। এ অবস্থায় সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে সহায়তা করা আমাদের জন্য ফরজ হয়ে গেছে।'

গোয়েন্দা বললো, 'যেদিন তিনি এ বক্তব্য দেন, সে রাতেই কে বা কারা তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় হুজরাখানায় খুন করে ফেলে রেখে যায়।'

o

দামেশক। সুলতান আইয়ুবী দু'তিনদিন ধরে ক্রমাগত সৈন্যদের প্রস্তুতি ও মহড়া পরিদর্শন করলেন। গোয়েন্দাদের কাছ থেকে সর্বশেষ রিপোর্ট সংগ্রহ করলেন। রাতে খালি গায়ে শীতের মধ্যে সৈন্যদের যুদ্ধ করা দেখলেন।

কাছেই পাহাড়ী এলাকা। এরপর তিনি সৈন্যদের নিয়ে গেলেন সেই পাহাড় ও মরুভূমিতে। সেখানে তাদের এগিয়ে যাওয়া, পালিয়ে আসা প্রত্যক্ষ করলেন। দেখলেন অভ্যস্ত ঘোড়াগুলোর পাহাড়ে উঠা নামার দৃশ্য। অশ্বগুলো এমন দ্রুত ও অভ্যস্ত ভঙ্গিতে উঠা নামা করছিল যে, সুলতান নিজেও অভিভুত হয়ে পড়লেন।

ওদিকে খৃস্টান গোয়েন্দাদের কল্যাণে হলবে এ খবর পৌঁছে

গেল। খবর পাওয়ার সাথে সাথেই কনফারেন্সে মিলিত হলো খৃস্ট-মুসলিম সম্মিলিত বাহিনীর কমাণ্ডার ও সেনাপতিরা। সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যরা রাতেও যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে এ সংবাদে তারা তেমন বিচলিত হলো না। তারা তাচ্ছিল্যের সুরে বলতে লাগলো, 'আইয়ুবীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

অন্য জন বললো, 'আমাদের কাছে আসুক, তাঁর মাথার চিকিৎসা হয়ে যাবে।'

এভাবে নানা রকম হাসি তামাশার মধ্য দিয়ে শেষ হলো তাদের কনফারেন্স।

দামেশকে আস সালেহের গোয়েন্দা ছিল, শেখ মান্নানের ফেদাইন খুনী চক্র ছিল কিন্তু তারা কেউ সুলতানের এই যুদ্ধ প্রস্তুতিকে স্বাভাবিকের বাইরে কিছু মনে করেনি।

সম্রাট রিমাণ্ড তার একজন দক্ষ গোয়েন্দাকে দায়িত্ব দিয়ে রেখেছিলেন, সুলতান আইয়ুবীর প্রতিটি তৎপরতার রিপোর্ট নিয়মিত তাকে সরবরাহ করতে। তার কাছ থেকে রিপোর্ট পেয়েই তিনি হলবে কনফারেন্স ডাকিয়েছিলেন। কিন্তু কেন সুলতান এ রকম তৎপরতা চালাচ্ছেন তা তিনি নিজেও বুঝে উঠতে পারলেন না।

সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দা দল হলব ও মুসালে জালের মত ছড়িয়ে ছিল। তাদের কেন্দ্রীয় কমাণ্ডও তখন হলবেই আত্মগোপন করেছিলেন। তিনি একজন আলেমের বেশে সেখানে অবস্থান করছিলেন এবং গোয়েন্দাদের সংগৃহীত সমস্ত তথ্য একত্র ও যাচাই বাছাই করে তা আবার গোপনে দামেশকে পাঠিয়ে দিতেন।

তিনি বিপদের সময় তাদের আত্মগোপন করার ব্যবস্থা করে

দিতেন। প্রকাশ্যে তিনি ছিলেন সুলতান আইয়ুবীর একজন চরম বিদ্বেষী ও ঘোর সমালোচক। অনেক সময় সুলতানকে গালমন্দ করতেও কসুর করতেন না।

সেখানে লোকেরা তাঁকে খুবই সম্মান ও শ্রদ্ধা করতো। আমীর, উজির ও উচ্চশ্রেণীর লোকেরাও তাঁকে সম্মানের চোখে দেখতো। তাঁর গোয়েন্দারা গুরুত্বপূর্ণ সব স্থানেই ছড়িয়ে ছিল। আল-মালেকুস সালেহের মহলের বডিগার্ডদের মধ্যেও তার গোয়েন্দা ছিল।

দু'জন গোয়েন্দা বিশেষ প্রহরী হিসেবে খলিফার কেন্দ্রীয় কমাণ্ডের সেই অফিসে থাকতো, যে অফিস কক্ষে তাদের যুদ্ধের পরামর্শ সভা বসতো।

খৃস্টান গোয়েন্দাদের কমাণ্ডার বললো, 'প্রথমে দামেশকে গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়াতে হবে এবং হলবে সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দাদের জোর অনুসন্ধান চালিয়ে খুঁজে বের করতে হবে।'

সুলতান আইয়ুবীর যে দু'জন গোয়েন্দা হলবের হাই কমাণ্ডের পাহারাদার ছিল তাদের মধ্যে একজনের নাম খলিল। সে যেখানে পাহারায় ছিল সেখানকার হলরুমেই আমন্ত্রিত অতিথিদের সম্মানে নাচ-গানের আসর বসতো। হলরুমটি ছিল সাজানো গোছানো।

যখন হলবের আমীর ও উজিররা খৃস্টানদের সাথে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলো তখন এ হলরুমটি আরও জাঁকজমকপূর্ণভাবে সাজানো হলো। নাচ গানের আয়োজনেও আনা হলো বৈচিত্র।

নাচের জন্য যোগাড় করা হলো বাছাই করা সুন্দরী নর্তকী।

যৌবনের সম্পদে পরিপূর্ণ এ মেয়েরা নাচগানে ছিল বেজায় পটু। এ নর্তকীর মধ্যে নতুন করে অন্তর্ভুক্ত হলো কয়েকটি খৃস্টান মেয়ে। এ মেয়েরাও পেশাগত নর্তকী হিসাবেই জায়গা পেল এ আসরে।

এরা ছিল মূলত খৃস্টান গোয়েন্দা। আস সালেহের উজির ও আমীরদের আঙ্গুলের ডগায় নাচানোর জন্যই এদেরকে আমদানী করেছিল খৃস্টানরা।

তাদের দায়িত্ব ছিল, বিশেষ বিশেষ আমীর ও সামরিক অফিসারদের নিয়ন্ত্রণে ও চোখে চোখে রাখা। তারা খোঁজ রাখবে, সুলতান আইয়ুবীর কোন ভক্ত ও তাবেদার তাদের সংস্পর্শে আসে কিনা। এ ছাড়াও উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের মনে খৃস্টানদের প্রতি ভালবাসা ও ক্রুসের প্রতি সম্মান দেখানোর অভ্যাস সৃষ্টি করার দায়িত্ব ছিল এদের।

নাচগানের সাথে থাকতো শাহী ভোজের ব্যবস্থা। ভোজের সময় পুরোদমে চলতো শরাব পান। সোরাহীর পর সোরাহী শূন্য হয়ে যেতো।

নেশায় যখন ঢুলুঢুলু হয়ে যেতো মেহমানদের চোখগুলো, তখন জোড়ায় জোড়ায় বিভিন্ন কামরায় ঢুকে পড়তো আমন্ত্রিত মেহমানবৃন্দ।

এই হলরুমেই যুদ্ধের আলোচনা ও পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হতো। হলরুমের প্রধান দরজায় দু'জন প্রহরী কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে, হাতে বর্শা নিয়ে একভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতো। চার ঘন্টা পর পর বদল হতো প্রহরীদের ডিউটি। অধিকাংশ সময়ই খলিল ও সুলতান আইয়ুবীর অপর গোয়েন্দার ডিউটি এক সাথেই পড়তো।

এখান থেকে তারা অনেক তথ্য সংগ্রহ করতো আর সে সব তথ্য তাদের কমাণ্ডারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিত দামেশকে।
এক সন্ধ্যায় এ জলসায় এলো এক নতুন নর্তকী। মেহমানরা একে একে আসছে। নর্তকী ও গায়িকার দল এবং অন্যান্য মেয়েরাও আসছে দল বেঁধে।
খলিল ও তার সঙ্গী এদের সবাইকে জানতো ও চিনতো। দুর-দূরান্তের কেল্লার অধিপতিরাও আসতো এ আসরে। হঠাৎ তারা লক্ষ্য করলো, একজন অপরিচিত মেহমান তাদের পাশ কেটে হলরুমে ঢুকছে।
লোকটির পরিচয় উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল খলিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই পরিচয় পেয়েও গেল। এ লোক ছিল রিমাণ্ডের গোয়েন্দা বিভাগের চৌকস ও ঝানু এক অফিসার।
এ লোক কেন এসেছে, কি করে, জানার তাগিদ অনুভব করলো খলিল।
কিছুক্ষণ পর সে আরও একটি নতুন মুখ দেখলো। না, একেবারে নতুন নয়, গত তিন চার দিন ধরেই সে এই মেয়েকে দেখছে।
খলিল তার সঙ্গীর সাথে ডিউটি শেষ করে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কোত্থেকে মেয়েটি তাদের সামনে এসে পড়ল।
হতচকিত হয়ে থমকে দাঁড়াল ওরা। এই মুখটি কেন যেন খলিলের চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। কিন্তু সে ভাবলো, চেহারার মত চেহারাও তো থাকতে পারে! সে মেয়েটির দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল।
কিন্তু মেয়েটি তাকে গভীরভাবে লক্ষ্য করলো এবং তার দিকে এগিয়ে এল। খলিল ও তার সঙ্গী যেন এসব খেয়ালই করেনি

এমনি একটি ভাব নিয়ে সরে গেল সেখান থেকে।
দ্বিতীয় দিনও এমন হলো। ওরা ডিউটি শেষ করে রওনা হতেই মেয়েটি সামনে পড়লো তাদের। খলিল মেয়েটিকে নর্তকী মনে করলেও তার চেহারা থেকে শাহজাদীর জৌলুস ঝরে পড়ছিল।
খলিল একজন পাহারাদার মাত্র, তার সাথে সম্পর্ক করার জন্য এমন মেয়ের তো আগ্রহী হওয়ার কথা নয়! তাহলে সে কি চায় তার কাছে? কেন তার পথ আগলে দাঁড়াতে আসে? প্রশ্নটি ভাবিয়ে তুললো তাকে।
এমন সুন্দরী, শাহজাদীর মত যার রূপ জৌলুস, সেকি আসলেই কোন নর্তকী, নাকি কোন আমীরের আদুরে কন্যা! এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ করেই তার সেই মেয়ের কথা স্মরণ হলো, যে মেয়ের চেহারা তার হৃদয়ের অনেক গভীরে লুকিয়ে রেখেছিল সে এতদিন!

০

সে এগারো বারো বছর আগের কথা! খলিল তখন সতেরো আঠারো বছরের নওজোয়ান। খলিলের মন থেকে প্রায় মুছেই গিয়েছিল সে স্মৃতি। হঠাৎ করে এত বছর পর সেই স্মৃতির কথা মনে হতেই বিষন্নতায় ছেয়ে গেল তার মন।
তখন সে দামেশক থেকে কিছু দূরে একটি গ্রামে বাস করতো। বাবার সঙ্গে কৃষি কাজ করতো মাঠে গিয়ে। দেখতে সে খুবই সুন্দর ছিল, বয়সটাও ছিল কাঁচা হলুদের মত। নবীন

যুবকের সজীবতা ছিল তার মুখমণ্ডলে।
সে ছিল খুব হাসি খুশী ও প্রাণবন্ত। রসিকতা পছন্দ করতো। কথাবার্তায় চটপটে ও সর্বদা প্রফুল্ল হৃদয় থাকায় গ্রামের শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই তাকে খুব ভালবাসতো।
সে সময় বিভিন্ন অঞ্চলে খৃস্টানদের আধিপত্য ছিল। ফলে মুসলমানদের ওপর জোর-জুলুম ও নির্যাতন চলতেই থাকতো। এই নির্যাতনের শিকার হয়ে সেখান থেকে হিজরত করে মুসলমান শাসিত অঞ্চলে চলে যেতো লোকজন। এই হিজরতের সময় স্থানীয় লোকেরা তাদেরকে পূর্ণ সাহায্য সহযোগিতা করতো। যেখানে হিজরত করতো সেখানকার লোকেরাও সাধ্যমত তাদের পূণর্বাসনের ব্যবস্থা করে দিত।
এমনি একটি পরিবার কোথাও থেকে হিজরত করে খলিলদের গ্রামে এলো। সেই পরিবারে হুমায়রা নামে একটি এগারো বারো বছরের বালিকা ছিল। সেই কিশোরীর চাপল্যভরা কমনীয় চেহারা খোদাই হয়ে গিয়েছিল নবীন যুবক খলিলের মনে।
গ্রামবাসীরা সে পরিবারকে পূণর্বাসনের ব্যবস্থা করে দিল। তাদের চাষাবাদের জন্য জমি ও আসবাবপত্রের ব্যবস্থাও করে দিল। হুমায়রার ভাইবোন ছিল ছোট। কাজ করা ও সংসার চালানোর দায়িত্ব পুরোপুরি তার বাবার উপরেই ছিল।
খলিল তার সংসারের কাজে সহযোগিতা করতে শুরু করলো। হুমায়রা ও খলিল কাজের ফাঁকে মেতে থাকতো হাসি-তামাশায়। খলিলের চটপটে কথা, উজ্জ্বল হাসি, মায়াভরা চাউনি সবই খুব ভাল লাগতো হুমায়রার। খলিলেরও মেয়েটাকে ভাল লাগতো।
মেয়েটি খলিলদের বাড়ি আসা-যাওয়া করতো। বাড়িতে হোক

অথবা ক্ষেতে খামারে হোক, সময় পেলেই হুমায়রা তার কাছে গল্প শোনার জন্য ছুটে আসতো। খলিলও সুন্দর সুন্দর গল্প বানিয়ে রাখতো তাকে শোনানোর জন্য।

দু'চার মাস পর হুমায়রার বাবার কি যে হলো, ক্ষেত-খামারের কাজে অমনোযোগী হয়ে উঠলেন তিনি। দামেশক শহর কাছেই ছিল। সে সকালে শহরে চলে যেতো আর সন্ধ্যায় ফিরে আসতো শহর থেকে।

এক বছর পর সে কৃষি কাজ পুরোপুরিই ছেড়ে দিল। কেউ জানতো না, সে উপার্জনের কি পথ বেছে নিয়েছে। কিন্তু দেখা গেল, দিন দিন তার আর্থিক অবস্থার বেশ উন্নতি হচ্ছে।

হুমায়রা ও খলিলের মধ্যে আন্তরিকতা গভীর হয়ে গেল। সে ক্ষেত-খামারের কাজে যে মাঠে যেত, হুমায়রাও চলে যেত সেখানে। যদি বাড়িতে থাকতো, তবে সে চলে আসতো খলিলদের বাড়িতে।

এখন সে তেরো বছরের তরুণী। নিজের ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় একটু একটু বুঝতে শিখেছে। খলিল একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার বাবা কি কাজ করেন?'

হুমায়রা বললো, 'বাবা কি কাজ করেন, কোত্থেকে আয় রোজগার করেন, সে সব আমি কিছুই জানিনা। বাবা তো ঘুম থেকে উঠেই শহরে চলে যায়, ফিরে সেই রাত করে।'

'তোমার বাবা প্রায়ই শহর থেকে নেশা করে বাড়িতে আসেন, এটা আমার ভাল লাগে না।'

হুমায়রা লজ্জিত হয়ে বললো, 'আসলে তোমাকে কখনো বলা হয়নি, এ লোক আমার বাবা নন! আমার মা ও বাবা যখন মারা যান তখন আমি পাঁচ ছয় বছরের শিশু। এ লোক আমাকে তার

বাড়িতে নিয়ে আসেন।

তিনি আমাকে আপন কন্যার মত স্নেহ-যত্ন করতে লাগলেন দেখে আমিও তাকে বাবা বলে ডাকতে লাগলাম। আমি তোমার সাথে একমত, এ লোক কোন ভাল মানুষ নয়।'

দেড় দুই বছর কেটে গেল। হুমায়রা ও খলিলের কৈশোরের খেলা এখন ভালবাসায় রূপ নিয়েছে। যৌবনের রঙ লেগেছে দুই তরুণ তরুণীর মনে। হুমায়রার সারা অঙ্গে এখন মুগ্ধতার আমেজ। চেহারা টইটুম্বুর বর্ষার নদী। নয়নে শিকারীর সুতীক্ষ্ণ বান। কণ্ঠে দূরাগত ঝর্ণার গান।

একদিন সে পেরেশান প্রাণে ছুটে গেল খলিলের কাছে। মনে হলো আচমকা ঘুর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে গিয়েছিল। উদ্বেগ ও উত্তেজনায় হাপড়ের মত উঠানামা করছে তার বুক। একটু দম নিয়ে সে খলিলকে বললো, 'বাবা আমাকে বিয়ের কথা বলে এক আগন্তুকের কাছে বিক্রি করে দিতে চায়! আমাকে বাঁচাও খলিল!'

'কি বলছো তুমি!' খলিল যেন আকাশ থেকে পড়ল।

'হ্যাঁ, বাবার সঙ্গে একটি লোক এসেছে। বাবা তাকে অনেক আদর আপ্যায়ন করলেন এবং অনেকক্ষণ পরে সেখানে আমাকে ডেকে নিয়ে তাকে দেখালেন। আগন্তুক দীর্ঘ সময় ধরে গভীরভাবে আমাকে দেখলো।' হুমায়রা বলতে থাকলো, 'আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এসব কি হচ্ছে! কেন ডাকা হয়েছে আমাকে?'

বাবা আমতা আমতা করতে লাগল। কোন সদুত্তর পেলাম না বাবার কাছ থেকে।'

হুমায়রা কথা শেষ করলো না, খলিলের হাত জড়িয়ে ধরে

বললো, 'তোমাকে ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করতে পারবো না, এই বিপদের হাত থেকে তুমি আমাকে বাঁচাও।'

খলিল তাকে বললো, 'আমি এ নিয়ে আজই আমার বাবা মায়ের সঙ্গে আলোচনা করবো। তুমি কোন চিন্তা করো না, আম্মা তোমাকে খুবই পছন্দ করেন। বাবাকে তিনি নিশ্চয় রাজি করাতে পারবেন। তারা কেউ বিয়েতে অমত না করলে শীঘ্রই তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক পাকাপোক্ত করে নেবো।'

হুমায়রা যাকে বাবা বলে ডাকতো, সে তার আসল বাবা ছিল না। ফলে হুমায়রার ভবিষ্যত নিয়ে তার কোন উদ্বেগ বা চিন্তাই ছিল না। তাছাড়া সে যুগে এমনিতেও মেয়েদের কোন মর্যাদা ছিল না। অনেক টাকার বিনিময়ে মেয়েকে বিয়ে দেয়ার প্রচলন সে যুগে সবখানেই ছিল।

আমীর ও ধনী ব্যক্তিরা রঙমহল বানিয়ে রেখেছিল আমোদ স্ফুর্তির জন্য। নতুন নতুন সুন্দরী মেয়েদের ক্রয় করে সেখানে তাদেরকে সাজিয়ে রাখতো ওরা। যদি হুমায়রার বাবা তাকে বিক্রি করে দেয় তাতে সামাজিকভাবে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হবে না বা এতে কেউ আশ্চর্যও হবে না।

খলিল ধনী বাবা-মায়ের আদরের দুলাল ছিল না যে, তার বাপ সন্তানের যে কোন আবদার মেনে নেবেন। খলিলের মত ছেলের জন্য তিনি যেখানে ধনীর দুলালী এবং যৌতুক দু'টোই সংগ্রহ করতে পারবেন, সেখানে এ বিয়ে তিনি মেনে না-ও নিতে পারেন।

তা ছাড়া হুমায়রার পিতা তার আসল বাবা নয় জানলে খলিলের বাবা এ বিয়েতে অসম্মতি জানাতে পারেন। তাহলে কি হবে? দারুণ চিন্তায় পড়ে গেল খলিল। হুমায়রার সাথে তার সম্পর্ক

এখন এতটা নিবিড়, ইচ্ছে করলেই একজন আরেকজন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে না।
হুমায়রাকে পাঠিয়ে দিয়ে এসবই ভাবছিল খলিল। সে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল, যদি বাবা এ বিয়েতে রাজি না হন তাহলে হুমায়রাকে নিয়ে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবো।
পালিয়ে গেলে কোথায় আত্মগোপন করা যায় তাই নিয়ে এবার চিন্তা করতে লাগল খলিল। এ চিন্তা করতে করতে দীর্ঘ সময় পার করে দিল সে।
তিন দিনের দিন ঘটলো সেই অনাকাঙ্খিত করুণ ঘটনা। হুমায়রা খলিলকে ডাকতে ডাকতে পাগলের মত ছুটে এল সে যে মাঠে কাজ করছিল, সেখানে। খলিল তাকিয়ে দেখলো, তিনজন লোক তার পিছন পিছন দৌড়ে আসছে। এদের একজন হুমায়রার বাবা, অন্য দু'জনকে সে চিনতে পারলো না। একটু পর। গ্রামের বহুলোক সেখানে জড়ো হয়ে গেল। এরা সবাই শুধু তামাশা দেখতে এসেছে। বাস্তবে তাদের করার কিছু ছিল না। কেউ হুমায়রার সাহায্যে এগিয়ে যেতে পারলো না, কারণ তার পিছনে হুমায়রার বাবাও আছে। এ ক্ষেত্রে বাবার ওপর দিয়ে কারো কথা বলা সাজে না।
হুমায়রা খলিলের পিছনে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। সে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো, 'এ দু'জন লোক আমাকে ধরে নিয়ে যেতে চায়। তারা বলছে, বাবা নাকি তাদের কাছে আমাকে বিক্রি করে দিয়েছে। আমি এ বিক্রয় মানি না, বাবাকে বলো ওদের টাকা ফিরিয়ে দিতে। এই অচেনা লোকদের চলে যেতে বলো, আমি যাবো না ওদের সাথে।'
হুমায়রার বাবা খলিলের পিছন থেকে হুমায়রাকে ছিনিয়ে নিতে

চেষ্টা করলো। খলিল তাকে ধাক্কা দিয়ে বললো, 'সাবধান! এর গায়ে হাত লাগানোর আগে প্রথমে আমার সাথে কথা বলো।'
'ও আমার মেয়ে!' বাবা বললো, 'তুমি বাঁধা দেয়ার কে?'
'এ তোমার মেয়ে নয়।' খলিল জোর দিয়ে বললো।
উপস্থিত লোকজন সব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।
লোক দু'জন হুমায়রাকে ধরার জন্য তার দিকে এগিয়ে গেল। হুমায়রা লুকিয়েছিল খলিলের পেছনে, একজন তলোয়ার বের করে আক্রমণ করলো খলিলকে। খলিলের হাতে ছিল কোদাল, সে কোদাল দিয়ে আঘাত ঠেকিয়ে পাল্টা আঘাত করলো হামলাকারীর ওপর।
লোকটি এতটা আশা করেনি, সে কিছু বুঝে উঠার আগেই কোদালের আঘাত তার মাথায় গিয়ে পড়লো। হাত থেকে ছিটকে পড়লো তলোয়ার।
অন্য লোকটিও তলোয়ার বের করে আঘাত করতে গেল খলিলকে। খলিল দ্রুত প্রথম আক্রমণকারীর তলোয়ারটি উঠিয়ে নিল।
তলোয়ার চালানোর অভ্যাস ছিল না তার, তবুও সে হামলাকারীর আঘাত থামিয়ে দিল। লোকটি তলোয়ার চালনায় পটু ছিল, খলিল আঘাত করার পরিবর্তে আঘাত প্রতিহত করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু তলোয়ার যুদ্ধেরও বেশীক্ষণ সুযোগ পেল না সে, কোন ভারী জিনিস এসে তার মাথায় আঘাত করলো।
চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল তার। সঙ্গে সঙ্গে সে পড়ে গেল। যখন তার জ্ঞান ফিরলো, তখন সে বাড়িতে বিছানায় শুয়ে ছিল।

সে আবেগে ও রাগে উঠে বসলো। কিন্তু তার বাবা ও দু'তিন জন লোক তাকে চেপে ধরলো। বললো, 'বিশ্রাম নাও বাবা, অনেকক্ষণ পর তোমার হুঁশ ফিরেছে। যা দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলে আমাদের!'

'হুমায়রা কোথায়?' ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করলো সে।

'ওকে ওর বাবা সেই লোক দুটোর হাতে তুলে দিয়েছে। ওরা মেয়েটিকে নিয়ে অনেক আগেই গ্রাম থেকে চলে গেছে।'

খলিল ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলতে লাগলো, 'একটি মেয়েকে এভাবে বিক্রি করতে দিলে তোমরা?'

তাকে বলা হলো, 'বিয়ে পড়িয়েই বিদায় দেয়া হয়েছে তাকে।'

খলিলের অবস্থা এমন ছিল যে, সে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে কিন্তু মাথা ঘুরে পড়ে যায়। তার মাথায় ভীষণ আঘাত লেগেছিল।

মুরব্বিগণ উপদেশ দিলেন, 'হুমায়রার ব্যাপারে তোমার কথা বলা জায়েজ নয়। কারণ যদি বিক্রিও করে থাকে, তবুও নিয়মানুসারে বিয়ের কবুল পড়ানোর পরই তাকে ওদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।'

সুতরাং খলিলের জন্য ব্যাপারটি একটি মারাত্মক দুর্ঘটনা হয়ে রইল।

খলিল একটু সুস্থ্য হয়ে হুমায়রাদের বাড়িতে গিয়ে দেখতে পেল, বাড়িতে কেউ নেই। মেয়েকে লোকগুলোর হাতে তুলে দেয়ার পরদিনই তার বাবা পরিবার পরিজন নিয়ে চিরদিনের জন্য গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে।

০

আলী বিন সুফিয়ান তার বাহিনীকে কেবল সামরিক প্রশিক্ষণই দিতেন না, তাদের নৈতিক উন্নতি ও ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী করে তোলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতেন। ফলে তার বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের অন্তরে ইসলামী জোশ ও জযবা থাকতো অটুট।

খলিল এই বাহিনীতে শামিল হওয়ার পর জীবন ও জিন্দেগীর যে অর্থ ও স্বাদ খুঁজে পেয়েছিল তাতে হুমায়রার কথা সে পুরোপুরি ভুলে গিয়েছিল। কারণ কাউকে মনে রাখার মত সময় ও অবসর কোথায় তার! কিন্তু এই নতুন নর্তকী তার মনে নতুন করে হুমায়রার স্মৃতি জাগিয়ে দিলো।

হুমায়রার সাথে তার দেখা নেই সাত-আট বছর। সে সময় হুমায়রা ছিল নবীন যুবতী। বয়স মাত্র পনেরো-ষোল। এই নতুন নর্তকী ভরা যৌবনের, বয়স চব্বিশ-পঁচিশ হবে। হুমায়রার মত সুন্দরী হলেও তার চেহারায় সেই সরলতা ও নির্মলতার ছাপ নেই। নেই সে শালীনতা ও লজ্জার ভূষণ।

এই উলঙ্গপ্রায় নর্তকী কি করে সেই হুমায়রা হবে? খলিলের মনে এ প্রশ্ন যেমন দানা বাঁধল, তেমনি তার চেহারা, চোখের চাউনি এবং আরো কিছু মুদ্রা তাকে বলতে লাগলো, এই সে হুমায়রা। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের এক সংকটময় আবর্তে পড়ে গেল খলিল।

নর্তকী তৃতীয় দিনের মত যখন তাদের সামনে এসে খলিলের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালো তখন খলিলও দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

'তোমার নাম কি?' নর্তকী জিজ্ঞেস করলো।

খলিল তার আসল নাম গোপন করে যে নামে এখানে ভর্তি হয়েছে সে নাম বললো। আর বললো, 'আপনি আমার নাম কেন জিজ্ঞেস করছেন?'

'ঘুরে ফিরে তোমাকেই বেশী ডিউটিতে দেখি, তাই তোমার নাম জিজ্ঞেস করে রাখলাম, যদি কখনো দরকার পড়ে।' নর্তকী এমন ভঙ্গি ও ভাষায় কথা বললো যেমন ভদ্র মহিলারা বলে থাকে! তার কথায় যেমন কোন সংকেত বা আবেদন ছিল না, তেমনি ছিল না কোন সংকোচ বা আড়ষ্ঠতা। সে আরো বললো, 'নিজের কাজের দিকে ঠিকমত খেয়াল রেখো।'

মেয়েটির এ কথায় খলিলের আত্মসম্মানে একটু আঘাত লাগলো বটে, তবে সে খুশী হলো এই ভেবে, 'যাক বাবা, এ মেয়ে হুমায়রা নয়। হুমায়রা তো সাদাসিদা এক সরল মেয়ে!'

সেদিন সন্ধ্যা। হলে ভোজসভার আয়োজন চলছে। রিমাণ্ডের গোয়েন্দা-কমাণ্ডার উইণ্ডসারের সম্মানে আজকের এ ভোজসভা। খলিল বুঝে নিয়েছিল, এ লোক বড় ধুরন্ধর। গোয়েন্দা কাজে খুবই দক্ষ। নিশ্চয়ই সে এখানকার ফাঁকফোঁকড়গুলো খুঁজে পেতে চেষ্টা করবে। নতুন করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা মজবুত করার জন্য সে কি কি পদক্ষেপ নেয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে লাগল খলিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার গভীর হয়ে এলো। হলরুমে মেহমানদের আগমন শুরু হয়ে গেছে। ডিউটিতে এলো খলিল ও তার বন্ধু। একটু পর খাবার পরিবেশন শুরু হবে, সেই সাথে চলবে শরাব পরিবেশন ও নাচ। লোকজন তারই অপেক্ষায়।

এখনও উইণ্ডসার আসেনি। লোকজন এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে-

বসে গল্পগুজব করছিল। খলিল ও তার সঙ্গী দাঁড়িয়ে ছিল হলের দরজায়।

কিছুক্ষণ পরই উইণ্ডসারকে আসতে দেখলো খলিল। সে প্রহরী দু'জনের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। গভীরভাবে দেখলো ওদের। শেষে খলিলের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললো, 'তুমি খলিফার রক্ষী হিসেবে কতদিন হলো এসেছ?'

'এখানে আসার পরই আমাকে রক্ষী দলে নেয়া হয়েছে।' খলিল উত্তর দিলো, 'তার আগে আমি দামেশকের সেনাবাহিনীতে ছিলাম।'

'তুমি মিশরও গিয়েছিলে?' উইণ্ডসার প্রশ্ন করলো।

'না!'

উইণ্ডসার পাশের প্রহরীকে খলিলের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি একে কতদিন থেকে জানো, চেনো?'

'আমরা দু'জন দামেশকের সেনাবাহিনীতে এক সাথেই ছিলাম।' অন্য প্রহরী বললো, 'আমরা একে অপরকে খুব ভালমতই চিনি।'

'আমি সম্ভবত: তোমাদের দু'জনকেই ভালমত জানি।' উইণ্ডসার একটু হেসে বললো, 'আমার সঙ্গে একটু এসো।'

সে ওদেরকে ডিউটি থেকে সরিয়ে তার সঙ্গে নিয়ে গেল। উইণ্ডসার ঘাগু গোয়েন্দা। এখানে এসেই সে প্রতিটি দেহরক্ষী সম্পর্কে তত্ত্ব-তালাশ নিতে শুরু করেছিল। খলিলকে দেখেই তার মনে খটকা লেগেছিল। যখন তার সাথীকে দেখলো তখন তার সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। আর সন্দেহটা ভুলও ছিল না। খলিল ও তার সাথী তিন চার বছর হলো গোয়েন্দা বিভাগে আছে। তারা দু'জনে বরাবরই একসাথে কাজ করার সুযোগ

পেয়েছে। ফলে তাদের বন্ধুত্ব দিনে দিনে গাঢ় ও অটুট হয়েছে।
উইগুসার তাদেরকে নিজের কামরায় নিয়ে গেল। হলরুম থেকে একটু দূরে আরেকটি প্রাসাদে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল তার।
সে কামরায় মশালের আলোয় ওদের মুখোমুখি বসে উইগুসার বললো, 'যদি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করো যে, তোমরা এখানে খুব বিশ্বস্ত আর সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে তোমরা শত্রু ভাবো, তবুও তোমাদেরকে আমি ছেড়ে দেবো না, বরং এমন কাজে লাগিয়ে দেবো যেখানে তোমরা আরামেই থাকবে।' উইগুসার বললো, 'তাই বলছি, মিথ্যে বলবে না। মিথ্যে বললে শেষে পস্তাতে হবে তোমাদের।'
'আমরা খলিফার অনুগত!' খলিল বললো।
'তোমাদের আনুগত্য কবে বদল করেছো?' উইগুসার বললো, 'আর কেন করেছো?'
'খোদা ও তার রাসূলের পরই খলিফার স্থান!' খলিল বললো, 'এখানে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কোন স্থান নেই।'
'মিশর থেকে কবে এসেছো?' উইগুসার জিজ্ঞেস করে উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললো, 'তোমরা মনে হয় আমাকে চিনতে পারোনি। আমিও তোমাদের মত গোয়েন্দা। তোমার নাম হয়ত ভুলে গেছি কিন্তু চেহারা তো আর ভুলিনি! আলী বিন সুফিয়ান এখন কোথায়? মিশরে, না কি দামেশকে?'
'আমি তার কিছুই জানি না।' খলিলের সাথী বললো, 'আমরা সাধারণ সিপাই মাত্র।'
উইগুসার দরজার কাছে গিয়ে তার চাকরকে ডাকলো। চাকর

এলে একটি মেয়ের নাম নিয়ে বললো, 'ওকে ডেকে দাও।'
মেয়েটি কাছেই কোন কামরায় ছিল। একটু পর সে এসে প্রবেশ করলো কামরায়, সাথে সেই নর্তকী, খলিল যাকে আগেই দেখেছে, কথাও বলেছে, যাকে দেখে খলিলের মনে হুমায়রার কথা জেগে উঠেছিলো।
উইগুসার খৃস্টান মেয়েটির সাথে আরবী ভাষায় কথা বললো। হেসে জিজ্ঞেস করলো, 'এই নাচনেওয়ালীকে আবার সঙ্গে আনলে কেন?'
মেয়েটি উত্তরে বললো, 'ও আমার কামরাতেই ছিল। আপনি যখন ডাকলেন, ভাবলাম দাওয়াত খেতে যাচ্ছেন, ও রেডি হয়েই এসেছিল, তাই সাথেই নিয়ে এলাম।'
'আচ্ছা, ঠিক আছে। কোন অসুবিধা নেই।' উইগুসার বললো, 'ভালই হলো, এসেছে যখন তামাশা দেখেই যাক।'
সে খৃস্টান মেয়েটিকে বললো, 'দাওয়াত খাওয়ার জন্য নয়, অন্য কাজে ডেকেছি তোমাকে।'
প্রহরী দু'জনের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, 'এ দু'জনের চেহারার দিকে একটু ভাল করে দেখো তো। হয়তো তোমার মনে কিছু স্মরণ হতে পারে।'
মেয়েটি তাকালো ওদের দিকে। গভীরভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কপালে চিন্তার রেখা টেনে বললো, 'কই, কিছু মনে পড়ছে নাতো!'
'আরে ভাল করে দেখো, নিশ্চয়ই মনে পড়বে।'
ও আবারো দেখলো, আর তখনই তার মনে পড়ে গেল ঘটনাটা। মুখে হাসি ফুটে উঠলো। সে খলিল ও তার সাথীকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাদের জ্ঞান ফিরেছিল কখন?'

দু'জন একে অপরের দিকে তাকালো, তারপর তাকালো মেয়েটার দিকে। খলিলের উপস্থিত বুদ্ধি ছিল প্রখর। সে বুঝতে পারলো, ওরা ঠিকই তাদের চিনে ফেলেছে। সে বাঁচার পথ চিন্তা করতে লাগলো।

তখন শুরু হলো তার বুদ্ধির খেলা, সে ছেলেমানুষী করে বললো, 'আমি বুঝতে পারছি না, আপনি আমাদের ডিউটি থেকে সরিয়ে এনে কেন এমন ঠাট্টা মজাক করছেন! আমরা ডিউটিতে নেই জানতে পারলে কমাণ্ডার কিন্তু কঠিন শাস্তি দেবে আমাদের।'

'দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।' উইণ্ডসার বললো, 'তোমাদের দু'জনকে সেখানে দাঁড় করানোর পরিবর্তে ও জায়গা খালি থাকাই ভাল। তোমরা যে আসলে প্রহরী নও, আমার চেয়ে তোমরাই তা ভাল জানো।'

সে খলিলের কাঁধে হাত রেখে বললো, 'এখানে আসার আগে তোমার চেহারা একটু পাল্টানোর দরকার ছিল। সুলতান আইয়ুবী ও আলী বিন সুফিয়ান গোয়েন্দাগিরিতে উস্তাদ, কিন্তু আমিও আনাড়ী নই। তোমরা নিজেকে বিপদে ফেলো না, বরং স্বীকার করো, তোমরা মিশর থেকে গোয়েন্দাগিরি করার জন্যই এখানে এসেছো।

তোমাদের সাথে আমার ও এ খৃস্টান মেয়েটির সাক্ষাৎ হয়েছিল মিশরে। তুমি আমাকে চিনতে পারোনি, কারণ তখন আমি ছদ্মবেশে ছিলাম। আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি, কারণ তুমি আজও সেই বেশেই আছ, যেমন সেদিন ছিলে। মনে করতে চেষ্টা করো, অবশ্যই তোমারও স্মরণ হবে সে কথা।'

সামান্য বিরতি দিল উইণ্ডসার। তারপর আবার বলতে শুরু

করলো, মনে করতে চেষ্টা করো, মিশরের উত্তরে একটি কাফেলা এগিয়ে যাচ্ছিল, তোমার মনে সন্দেহ জাগলো কাফেলা সম্পর্কে। তুমি এবং তোমার এ বন্ধুও যাত্রা করলে উত্তরে। রাতে এসে মিলিত হলে আমাদের সাথে। এক সাথে রাত কাটালে। কিন্তু তোমাদের দুর্ভাগ্য, ভোরে যখন চোখ খুললে, তখন তোমরা মরুভূমিতে একাকী পড়েছিলে। যে কাফেলাটিকে তুমি সন্দেহ করেছিলে, তারা তখন তোমাদের ধরা ছোঁয়ার অনেক বাইরে, দূরে, বহু দূরে চলে গেছে।

০

উইণ্ডসার তাকে স্মরণ করিয়ে দিল পুরনো দিনের স্মৃতি। খলিল ও তার এই বন্ধু তখন টহল ডিউটিতে ছিল। সে আজ থেকে আড়াই-তিন বছর আগের কথা। সুদানীদের পরাজিত করার পর খৃস্টানদের সহযোগিতায় তারা মিশর আক্রমণের পায়তারা করছিল। মিশরে খৃস্টান গোয়েন্দাদের তৎপরতা ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম খুব বেড়ে গিয়েছিল।
তাদের অনুসন্ধানে আলী বিন সুফিয়ান গোয়েন্দা বিভাগকে বিশেষভাবে তৎপর করে তোলেন। সীমান্ত এলাকায় টহলদার বাহিনীকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দিলে সীমান্তের গোয়েন্দারা মুসাফিরের বেশে সে এলাকায় ঘোরাফেরা করতে থাকে।
একবার খলিল তার এই সাথীর সঙ্গে মিশরের উত্তরে এমনি এক টহল ডিউটিতে ব্যস্ত ছিল। দু'জনই পথ চলছিল উটের

ওপর বসে। মরু মুসাফিরের সাধারণ পোষাক পরণে ওদের। তারা একটি কাফেল্যাকে যেতে দেখলো। তাদের সঙ্গে বহু উট ও কয়েকটি ঘোড়া। কাফেলার মধ্যে বৃদ্ধ, যুবক, শিশু এবং নারীও আছে।

খলিল ও তার সঙ্গী গোয়েন্দা হলেও এই বেশে তারা কাফেলা থামিয়ে চেক করতে পারছিল না। তাদের ওপর নির্দেশ ছিল, কোন কাফেলার ওপর সামান্যতম সন্দেহ হলেও, তারা যেন নিকটবর্তী ফাঁড়িতে সংবাদ দেয়। আর ফাঁড়ির দায়িত্ব ছিল, কাফেলা থামিয়ে অনুসন্ধান চালানো এবং তাদের আসবাবপত্র তদন্ত করে দেখা।

খলিল ও তার সাথী কাফেলার লোকদের সাথে শামিল হয়ে গেল এবং তাদের সাথে একত্রে চলার আগ্রহ প্রকাশ করলো।

সে যুগে নিয়ম ছিল, মুসাফিররা দল বেঁধে পথ চলতো। তাতে দীর্ঘ পথের একাকীত্ব দূর হতো এবং ডাকাতদের লুটপাটের ভয়ও কম থাকতো। কাফেলার লোকেরা তাদের দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে নিল।

দু'জন গল্পগুজবের ফাঁকে ফাঁকে সন্ধান নিতে লাগলো, এই কাফেলা কোত্থেকে এসেছে, কোথায় যাবে, এসব। তাদের আশা ছিল, সামনের সীমান্ত ফাঁড়িতে এদের ওপর তল্লাশী চালাবে। কিন্তু তারা দেখলো, কাফেলা এমন দিকে যাত্রা করেছে, যেদিকে কোন ফাঁড়ি নেই।

টহলদার সিপাহী ও পুলিশ ফাঁড়ির দৃষ্টি এড়িয়েও পথ চলার বিস্তর অবকাশ ছিল কাফেলার যাত্রীদের। পুলিশ ফাঁড়ি এড়িয়ে চলা এবং উটের ওপর মালসামানের বহর দেখে খলিলদের সন্দেহ আরো দৃঢ় হলো। কারণ, বড় বড় পাত্র ও জড়ানো তাবুর

মধ্যে কি জিনিস লুকানো আছে তা ওরা অনুমানও করতে পারছে না। মোট কথা, এ সবের মধ্যে কোন সাধারণ জিনিস ছিল না। ফলে ওরাও কাফেলার সাথে এগিয়ে চললো।

খলিল ও তার সাথী মরুভূমির যাযাবর হিসাবে পরিচয় দিয়েছিল নিজেদের। কাফেলার মধ্যে চারজন যুবতী ছিল, তাদের পোষাক পরিচ্ছদও যাযাবরদের মত। তাদের মাথার চুলের ভঙ্গি প্রমাণ করছে, এরা এখনো সভ্যতার স্পর্শ পায়নি, কিন্তু তাদের চেহারা, চোখের রং এবং আকর্ষণীয় দেহবল্লরী বলছে, এরা ছদ্মবেশী যাত্রী।

সেই কাফেলায় একজন বৃদ্ধ লোক ছিল। তার কুঁচকানো চামড়া, মাথার সাদা চুল ও সাদা পশম তাকে বুড়ো প্রমাণ করলেও তার দাঁত ও চোখের জ্যোতি বলছিল, এ লোকের বয়স বেশী নয়।

সেই বুড়ো খলিল ও তার সাথীর সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিল এবং খুব আদর করে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, 'তোমরা কোথা থেকে আসছো, কোথায় যাচ্ছো?' খলিল তার সব প্রশ্নেরই মিথ্যা জবাব দিয়ে গেল এবং তার কাছে থেকে জানতে চেষ্টা করলো, কাফেলা কোথায় যাচ্ছে? তাদের উটের পিঠে এতসব সামানপত্রে কি আছে? সেই বৃদ্ধ এমন সুন্দরভাবে কথা বলছিল যে, খলিল ও তার সাথী তার কথায় বিভ্রান্ত হয়ে গেল।

কাফেলা চলতে চলতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ওরা কোথাও থামলো না। শেষে রাত গভীর হলো, তবু কাফেলা চলতেই লাগলো। খলিল কাফেলার গতি ঘুরাতে চেষ্টা করলো। সে বৃদ্ধকে বললো, 'অমুক দিক দিয়ে গেলে জলদি ঠিকানায় পৌছে যাওয়া যাবে।'

তার উদ্দেশ্য ছিল, তাদেরকে ফাঁড়ির পাশ দিয়ে নেয়া। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, কাফেলা ফাঁড়ির আক্রমণ থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে।

খলিলের কথায় কাফেলার যাত্রীদের সন্দেহও দৃঢ় হতে লাগলো। কিছুদূর এগুনোর পর বিশ্রাম নেয়ার মত উপযুক্ত স্থান পাওয়া গেল। কাফেলা থেমে গেল ও সকলে বিশ্রামের প্রস্তুতি নিতে লাগল।

খলিল ও তার সাথী একটু দূরে আলাদা জায়গায় বসে চিন্তা করতে লাগলো, যখন সবাই ঘুমিয়ে যাবে তখন তাদের সামান তল্লাশী করা হবে। একজন নিরবে বের হয়ে গিয়ে কাছের ফাঁড়িতে খবর দেবে, যাতে কাফেলার ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালানো যায়।

কিন্তু তাদের ভয় হলো, কাফেলার লোকেরা টের পেলে একজনমাত্র গোয়েন্দাকে হয় হত্যা করে ফেলবে, নয়তো ধরে নিয়ে দ্রুতগতিতে অদৃশ্য হয়ে যাবে। তাই তারা আগের পরিকল্পনা বাদ দিয়ে দিল।

কাফেলার লোকেরা খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু খলিলরা না ঘুমিয়ে বরং জেগে থাকার চেষ্টা করলো।

সবাই ঘুমিয়ে গেলে কাফেলার দুই যাযাবর মেয়ে চুপিসারে তাদের কাছে এসে চোরের মত তাদের পাশে বসে পড়ল। মরুভূমির আঞ্চলিক ভাষায় মেয়ে দু'টি খলিল ও তার সাথীর সাথে নিচু স্বরে গল্প জুড়ে দিল।

তারা বললো, 'যদি আমরা তোমাদের কাছে গোপন বিষয় ফাঁস করি, তবে কি তোমরা আমাদের সাহায্য করবে?'

'গোপন রহস্য' এমন একটি কথা, যা শুনে সালাহউদ্দিন

আইয়ুবীর দুই গোয়েন্দা চমকে উঠল। কারণ তারা তো গোপন বিষয় উদ্ধারের জন্যই তাদের পিছু নিয়েছে।

তারা বললো, 'তোমরা যদি মনে করো আমাদের সাহায্য তোমাদের কোন কাজে লাগবে, তবে অবশ্যই আমরা সে সাহায্য তোমাদের দেবো।'

মেয়েরা তখন বললো, 'এই কাফেলা একটি নাচের পার্টি। ওরা আমাদের চারজন যাযাবর মেয়েকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা জানিনা কোথায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে এবং আমাদের ভাগ্যে কি আছে।'

মেয়েরা আরো বললো, 'আমরা মুসলিম যাযাবর, এই খৃস্টানদের কবল থেকে মুক্তি চাই আমরা।'

একটি মেয়ে খলিলকে বললো, 'আমাদের আরেকটু দূরে গিয়ে বসা উচিত।' সে খলিলকে নিয়ে আরেকটু দূরে গিয়ে বসল।

মেয়েটির কথায় সরলতা ছিল, আকর্ষণও ছিল। সে খলিলকে বললো, 'যদি আমাকে নিয়ে পালাতে পারো তবে সমস্ত জীবন তোমার খেদমত করে কাটিয়ে দেবো।'

সে এমন কথাও বললো, 'তোমাকে দেখেই আমার মনে হয়েছে তুমি আমাকে মুক্ত করতে এসেছো। বিশ্বাস করো, তোমাকে আমি মনে প্রাণে ভালবেসে ফেলেছি।'

সে ওদের উৎপীড়নের এমন বর্ণনা শুনালো যে, খলিল সমস্ত মেয়েদের মুক্ত করার কথা চিন্তা করতে লাগলো।

অন্য মেয়েটিও খলিলের সঙ্গীর সাথে বসে একই রকম কথা বলছিল।

কোন নারীর শুধু নারী হওয়াও একটা শক্তি। কারণ নারী যখন সুন্দরী ও যুবতী হয় এবং সেই সাথে মজলুম ও উৎপীড়িত হয়,

তখন পুরুষ তার ব্যথা-বেদনায় এক রকম গলেই যায়। এই অবস্থাই হলো এ দুই যুবকের। দু'জনেই এ মেয়েদের উদ্ধারের জন্য পাগল হয়ে উঠল।

তাছাড়া সে সময় সৈন্যদের বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করা হতো, মেয়েদেরকে সর্বক্ষেত্রে রক্ষা করার জন্য, সে নিজের হোক বা অন্যের। ফলে, দু'জনেই ওদের মুক্ত করার ওয়াদা দিল।

ওয়াদা পেয়ে মেয়ে দু'টি খুবই খুশী। কি করে ওদের আদর আপ্যায়ন করবে তাই নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লো। উপাদেয় খাবার খেতে দিল তাদের। একটি মেয়ে জগ ভর্তি শরবত নিয়ে এলো। খুবই সুস্বাদু শরবত। উভয়েই মাত্রাতিরিক্ত পান করে ফেললো।

কিছুক্ষণ পর।

তাদের চোখে নেমে এলো রাজ্যের ঘুম। যখন তাদের ঘুম ভাঙল তখন বেলা অনেক। সূর্য দিগন্ত থেকে অনেক উপরে উঠে গেছে। সারা রাত ও দিনের অনেক বেলা পর্যন্ত তারা শুয়েই কাটিয়ে ছিলো।

মরুভূমির উত্তপ্ত রোদ, শরীর ঝলসানো গরমও তাদের জাগাতে পারলো না। নির্দিষ্ট সময় পরে নেশার রেশ কাটতেই তারা হতচকিত হয়ে উঠে বসলো। সেখানে কোন কাফেলা ছিল না, তাদের নিজেদের উটও ছিল না। আর তারা সে জায়গায়ও ছিল না, যেখানে তারা রাত কাটানোর জন্য থেমে ছিল।

'একি! কাফেলা কোথায়? আমাদের উট কোথায়?' উদ্বিগ্ন হয়ে বলে উঠলো খলিল।

'আমরা যেখানে থেমেছিলাম এটা সে জায়গা নয়! এ আমরা

কোথায় এলাম!' বললো তার সঙ্গী।
তারা উঠে দাঁড়ালো। আশপাশে মাটি ও বালির টিলা। দু'জন দৌড়ে একটি টিলার উপরে গিয়ে উঠলো। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলো। একটি নিরেট পাহাড়ী অঞ্চল ও সুদূর বিস্তৃত বালুকায়ময় প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়লো না তাদের।

০

'সেই বৃদ্ধ লোকটি ছিলাম আমি, যার সঙ্গে তুমি কাফেলা চলার পথে কথা বলছিলে।' রিমাণ্ডের গোয়েন্দা বিভাগের কমাণ্ডার উইগুসার খলিলকে বললো, 'আমি তোমাদের কথাবার্তায় বুঝতে পেরেছিলাম, তোমরা গোয়েন্দা। সে জন্যই তুমি বার বার জানতে চাচ্ছিলে, আমরা কারা এবং কোথায় যাচ্ছি?'
'সে তো তুমি ছিলে না।' খলিল বললো, 'সে ছিল এক বৃদ্ধ লোক।'
'সেটা আমার ছদ্মবেশ ছিল!' উইগুসার বললো, 'আমি খুশী যে, তোমরা দু'জনই স্বীকার করেছ, তোমরা গোয়েন্দা এবং এখনও তোমরা গোয়েন্দাগিরি করতেই এখানে আছো। আমি তোমাদের জানাতে চাই, যে দুই মেয়ে তোমাদের বেহুশ করেছিল তাদেরই একজন এই মেয়ে!'
'আমরা এখন আর গোয়েন্দা নই।' খলিল বললো, 'এখন আমরা খলিফার অনুগত সৈনিক।'
'তুমি বাজে বকছো!' উইগুসার বললো, 'আলী বিন সুফিয়ানকে আমি সব সময় শ্রদ্ধার চোখে দেখি। প্রশংসা করি তার

নৈপুণ্যের। কিন্তু তোমাদের আরো প্রশিক্ষণ দরকার ছিল। তুমি এখনও নিজেকে গোপন করতে এবং ছদ্মবেশ বদলাতে শিখনি।'

উইগুসার তাকে জানালো, 'সে কাফেলায় আমরা যুদ্ধের অনেক সাজ-সরঞ্জাম ও অর্থ সম্পদ নিয়ে সুদান যাচ্ছিলাম। কাফেলায় যে সব লোক যাযাবরের পোষাক পরেছিল, তারা সব সামরিক উপদেষ্টা ছিল এবং সকলেই খৃস্টান ছিল। আর আমিই সুদানী ফৌজ গঠন করে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর ভাই তকিউদ্দিনকে এমন শোচনীয় অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছিলাম যে, শেষে সে অর্ধেক সৈন্য সুদানে ফেলে পালাতে বাধ্য হয়।

যদি সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী নতুন রণকৌশল প্রয়োগ না করতেন তবে তকিউদ্দিনের অবশিষ্ট সৈন্যও সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারতো না।

তোমাদের এ বিরাট বিপর্যয় ও পরাজয়ের কারণ ছিল ওই দুই মেয়ে। ওরা তোমাদের কাবু করতে না পারলে এতসব যুদ্ধ সামগ্রী নিয়ে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা ছিল আমাদের।'

উইগুসার তাকে আরো বললো, 'সে রাতে বিশ্রামের সময় আমাদের কেউ ঘুমায়নি। তোমাদের দু'জনকে বেহুশ করার জন্যই আমরা আমাদের দুই মেয়ে সদস্যকে পাঠিয়েছিলাম তোমাদের কাছে। তোমরা বেহুশ হওয়ার সাথে সাথেই কাফেলা আবার যাত্রা শুরু করেছিল। কারণ আমরা জানতাম, এই অস্ত্র সুদানে না পাঠাতে পারলে বড় রকমের সাফল্য থেকে বঞ্চিত হবো আমরা।'

খলিলের সে সব ঘটনা খুব ভাল মতই মনে আছে। এত বড় শত্রু কাফেলা হাত থেকে বেরিয়ে গেছে এ কথা সব সময়ই

কাঁটার মত বিঁধতো তার বুকে। তার জীবনে এমন ঘটনা আর কখনও ঘটেনি।

এই হাহাকারের সাথে যুক্ত হয়েছিল আরেক অপরাধবোধ। এ ঘটনার রিপোর্ট ওরা হেডকোয়ার্টারে জানায়নি। শত্রুরা তাদেরকে চরম ধোকা দিয়েছে এই অপমানের কথা তারা দু'জন ছাড়া আর কেউ জানতো না। নিজেদের অযোগ্যতার কাহিনী বর্ণনা করে অপমান ক্রয় করার ইচ্ছে হয়নি তাদের, তাই এ কাহিনী ওরা গোপন করেছিল।

যে দুই মেয়ে জীবনে কলঙ্কের এত বড় দাগ দিয়েছিল, তাদেরই একজন এখন তাদের সামনে! খলিল ও তার সাথী দু'জনেরই মনে হলো কথাটা। কিন্তু এখন কিছু করার নেই তাদের। আবারো ওরা ধরা পড়ে গেছে সেই ধুরন্ধর খৃস্টান গোয়েন্দার হাতে।

আগের বার ওদের হাতে কোন প্রমাণ ছিল না, তাই প্রাণে মারার প্রয়োজন বোধ করেনি ওরা। কিন্তু এবার কিছুতেই প্রাণ নিয়ে পালাতে দেবে না।

এসব ভাবতে ভাবতে খলিল মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল, 'মরতে যদি হয় লড়াই করেই মরবো, কিছুতেই অস্ত্র সমর্পণ করবো না।

তার সাথীও একই রকম চিন্তা করছিল। সেও মনে মনে আমৃত্যু লড়াই করার সংকল্প গ্রহণ করলো।

'আমার একটা শর্ত তোমরা মেনে নাও।' উইণ্ডসার বললো, 'আমি তোমাদের ওপর এমন দয়া করব যা কোনদিন করিনি। তোমরা দু'জনই আমার গোয়েন্দা দলে শামিল হয়ে যাও। যত বেতন চাও দেব। যদি চাও তো দামেশকে পাঠাবো, অথবা যদি

চাও কায়রো পাঠিয়ে দেব। সেখানে তোমরা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর গোয়েন্দা সেজে থাকবে, কিন্তু কাজ করবে আমাদের। আমাদের যে গোয়েন্দা সেখানে কাজ করছে তাদের সহযোগিতা করবে। আর যদি তাদের পিছনে কোন গোয়েন্দা লেগে যায় তবে আগেই তাদেরকে সতর্ক করে দূরে কোথাও সরিয়ে দেবে।'

সে বলেই যাচ্ছিল, আর দু'জনে নিরবে শুনছিল তার কথা।

'কিন্তু আমরা যে আমাদের ওয়াদায় ঠিক থাকবো, তার গ্যারান্টি কি? আমাদের আপন ভুবনে একবার ফিরে যেতে পারলে আমরা তো আপনাকে পিঠও দেখাতে পারি?' বললো খলিল।

উইঙ্গসার একটু হাসলো। বললো, 'সে ভয় আমার নেই। তোমরা আমার শর্ত মেনে নেয়ার সাথে সাথেই আমার দলের একজন হয়ে যাবে, তাই নয় কি? আমার দলে যোগ দেয়ার পর তোমাদের প্রথম এ্যাসাইনমেন্ট হবে, এখানে আইয়ুবীর যত গোয়েন্দা আছে তাদেরকে ধরিয়ে দেয়া। তোমরা এ কাজ বিশ্বস্ততার সাথে করতে পারলে যে সাফল্য আসবে আমাদের, তাকে আমি ছোট করে দেখি না।

আর তারপর! তারপর তোমরা যেখানে যেতে চাও আমি বিনা দ্বিধায় পাঠিয়ে দেবো। কারণ আমি জানি, এরপর আইয়ুবীর কাছে তোমরা যতই সাফাই গাও, কেউ তোমাদের বিশ্বাস করবে না। দলে ফিরিয়ে নেয়া তো দূরের কথা, কোর্ট মার্শাল হবে তোমাদের। প্রাণের মায়ায় আমার ছায়াতলে থাকা ছাড়া তোমাদের কোন গতি থাকবে না।'

'তোমার এই শর্তগুলোর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই এবং এসব শোনারও আমার কোন আগ্রহ নেই। আর গোয়েন্দাদের

ব্যাপার! আমার জানাও নেই, এখানে আইয়ুবীর কোন গোয়েন্দা আছে কি না?'
'মনে হয় এটাও তোমার জানা নেই, আমার শর্ত অমান্য করলে তার পরিণতি কি হবে? তোমার এই নধরকান্তি দেহটার কি অবস্থা হবে?' উইগুসার বললো, 'যদি তুমি মনে করে থাকো, তোমাকে হত্যা করা হবে, তবে তোমার সে আশা পূরণ হবে না। আমি তোমাকে এমন তন্দুরে নিক্ষেপ করবো, যেখান থেকে তুমি মুক্তিও পাবে না, নিঃশেষও হতে পারবে না।'
সে হেসে বললো, 'তুমি কি আমাকে বুঝাতে পারবে যে, তুমি মানুষ নও? অথবা তোমার বুদ্ধি এতই বেশী যে, তুমি আমাকে ধোকা দিতে পারবে? যদি তোমার তেমন জ্ঞানই থাকতো তবে তুমি ঐ অচেনা মেয়ের হাতে বোকা সেজে যেতে না। তার যৌবন ও সৌন্দর্যের জালে আটকে যেতে না।'
'শোন আমার খৃস্টান বন্ধু!' খলিল কর্কশ ভাষায় কথা বলে উঠলো, 'আমরা দু'জন গোয়েন্দা সত্য কিন্তু আমি ও আমার বন্ধু মেয়েদের যৌবন-জালে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম এ কথা মিথ্যা। মেয়েদের ব্যাপারে আমি পাষাণ! কিন্তু আমার দুর্বলতা ছিল অন্য জায়গায়।'
'সেটা কি রকম বন্ধু!' রহস্য-তরল কণ্ঠে বললো উইগুসার।
'অনেক দিন আগে, পনেরো ষোল বৎসরের একটি মেয়ে আমার সামনে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। আমি তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি! এক লোকের তলোয়ার কেড়ে নিয়ে একজনকে আহতও করেছিলাম।
তারা ছিল তিনজন আর আমি একা। তারা আমাকে ফেলে দিয়েছিল। যদি আমি বেহুশ না হতাম তবে সে মেয়েটাকে

বাঁচাতে পারতাম। তারা তাকে নিয়ে গেল, আর আমাকে লোকেরা অজ্ঞান অবস্থায় বাড়ি নিয়ে গেল। সেই মেয়ের কারণেই কোন নারী নির্যাতীতা বললে আমার আর হুঁশ থাকে না, তাকে মুক্ত করে দেয়ার জন্য জীবন বাজি রাখতে পারি আমি।'

'তোমার বাড়ি কোথায়?'

'মনে কর দামেশককে!' খলিল উত্তর দিল, 'আমি এখন আর কোন কথা গোপন করবো না। দামেশকের কাছে একটি গ্রাম, আমি সেই গ্রামের বাসিন্দা, আর আমার বন্ধু বাগদাদী! আমি একথা তোমার ভয়ে বলছি না, আর তুমি আমাকে এত সহজে ধরতেও পারবে না। শক্তি থাকে তো আমার হাত থেকে বর্শাটা কেড়ে নাও দেখি? আমার কাছ থেকে তলোয়ার নাও দেখি? যে তন্দুরের কথা তুমি বলছ, সেখানে আমি নই, দরকার হলে আমার লাশ যাবে।'

উইণ্ডসারের মুখে বিদ্রুপের হাসি ছড়িয়ে পড়ল। খৃস্টান মেয়েটি হেসে বললো, 'ওকে সজ্ঞানে শাস্তিতে মারতে হবে।'

নর্তকী গভীর দৃষ্টিতে খলিলের দিকে তাকিয়েছিল। তার মন হারিয়ে গিয়েছিল দামেশকের এক গ্রামে। বললো, 'আর সেই মেয়েটির কি হলো?'

'আমি তো বলেছি, সে মেয়েটাকে আমি বাঁচাতে পারিনি।' খলিল বললো, 'কিন্তু সে মেয়ের স্মৃতি আমার অন্তরে গেঁথে আছে।'

সে উইণ্ডসারের দিকে তাকিয়ে বললো, 'সে রাতে যখন আমরা দু'জন তোমাদের কাফেলার সাথে ছিলাম, তোমাদের দু'জন মেয়ে এসে বললো, তাদেরকে বিক্রির জন্য ধরে নিয়ে যাচ্ছো।

তখন আমার চোখের সামনে সেই মেয়েটির স্মৃতি ভেসে উঠলো, যাকে আমি বাঁচাতে পারিনি। আমরা এ মেয়ে দু'টির মুখে সেই মেয়েটিরই চেহারা দেখলাম। যদি আমার মনে সেই মেয়েটির স্মৃতি জেগে না উঠতো, তবে মেয়ে দু'টি আমাদের বোকা বানাতে পারতো না।'

নর্তকীর সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো, সে পিছনে সরে গিয়ে পালঙ্কের ওপর বসে পড়লো। তার চেহারার রঙ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'এখন আর আমাকে মৃত্যুও বোকা বানাতে পারবে না।' খলিল বললো, 'তোমার কোন লোভনীয় শর্তই আমাকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না।'

ওদিকে ভোজসভার হলঘরে উইগুসারের জন্য সবাই অপেক্ষা করছিল। নতুন নর্তকীর নাচ দেখারও অপেক্ষা ছিল তাদের। কিন্তু কেউই লক্ষ্য করলো না, হল ঘরের দরজার দুই প্রহরী ডিউটিতে নেই।

খলিল ও তার সঙ্গীর সাথে তখনও তাদের বর্শা ও তলোয়ার বহাল তবিয়তেই ছিল। উইগুসার যখন দেখলো, তার লোভনীয় শর্ত প্রত্যাখ্যান করে তারা তাদের ঈমানী দায়িত্বের ওপরই অটল, তখন সে তাদের অস্ত্রশস্ত্র জমা দিতে বললো। দু'জনই অস্ত্র সমর্পণ করতে অস্বীকার করলো।

উইগুসার তখন শক্তি প্রয়োগে অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার জন্য বাইরে তার বডিগার্ডদের ডাকতে দরজার দিকে অগ্রসর হলো। খলিল দ্রুত দরজা বন্ধ করে পথ আগলে দাঁড়ালো এবং বর্শার ধারালো ডগা উইগুসারের বুকে ঠেকিয়ে বললো, 'যেখানে আছো

সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো!'
সে বর্শার ধারালো ফলা বুক থেকে সরিয়ে তার গলার শাহ্‌রগের ওপর চেপে ধরলো।
খলিলের সাথী বর্শার ফলা খৃস্টান মেয়েটার ঘাড়ে ঠেকালো। উইগুসার ও মেয়েটা সরতে সরতে দেয়ালের সাথে গিয়ে ঠেকলো।
খলিল ও তার সাথী দু'জনকে দেয়ালের সাথে চেপে ধরে নর্তকীকে বললো, 'তুমিও এসে এদের সাথে দাঁড়িয়ে যাও। খবরদার, চিৎকার করবে না, চিৎকার করলে তোমার মরণ কেউ ঠেকাতে পারবে না।'
'যদি তুমি খলিল হও তবে আমি হুমায়রা।' নর্তকী বললো, 'আমি তোমাকে প্রথম দিনই চিনেছিলাম। আর তুমি চিনতে চেষ্টা করছিলে।'
একটু আগেই খলিল তার নাম ছাড়া সব কিছু বলে দিয়েছিল। হুমায়রা এখানে আসা অবধি খলিলকেই কেবল দেখছিল। তার মন বলছিল, এ খলিল। আবার সন্দেহ এসে তার বিশ্বাস গুড়িয়ে দিত, মানুষের মত মানুষও তো হয়!'
'তুমি কি গোয়েন্দা?' খলিল বললো।
'না! আমি শুধু নর্তকী!' হুমায়রা বললো, 'আমার উপরে কোন সন্দেহ করবে না। আমি তোমারই ছিলাম, তোমারই আছি। এখান থেকে বেরুতে পারলে তোমার সাথেই যাব, আর মরতে হলেও তোমার সাথেই মরবো।'

আস ছালেহ ভোজ সভায় উপস্থিত হলেন। তার সমস্ত আমীর, উজির ও অন্যান্য মেহমানরাও উপস্থিত। খৃস্টান সামরিক

অফিসার, যারা তার উপদেষ্টা হয়ে কাজ করছিল, তাদের ভঙ্গি ছিল বাদশাহর মত। মেহমানদের মধ্যে রিমাণ্ডের সামরিক প্রতিনিধিও ছিল। সে এবং অন্যান্য সবাই উইগুসারের জন্য প্রতীক্ষা করছিল। তারই সম্মানে এ সভা, অথচ সে-ই এখনো আসেনি!

খৃস্টান মেয়েরা হলরুমে কলরব করছিল। সেখানে সবাই হাজির, শুধু একজন বাদে। নর্তকীরাও সবাই এসে গিয়েছিল, শুধু নতুন নর্তকী অনুপস্থিত।

আস সালেহ আসার পর সবারই অস্থিরতা বেড়ে গেল। একজন এক চাকরকে ডেকে বললো, 'উইগুসার ও মেয়েদের খবর দাও। বলবে, সবাই এসে গেছে, আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে সকলে।'

'এদেরকে এখানেই বেঁধে চলে যাওয়া যাক।' খলিলের সাথী বললো।

'তুমি কি সাপকে জীবিত রাখতে চাও? জানো না, কাল সাপকে কখনো বাঁচিয়ে রাখতে নেই?' খলিল এ কথা বলেই বর্শার ফলা উইগুসারের গলায় পূর্ণ শক্তিতে চেপে ধরলো। মুহূর্তে উইগুসারের গলায় বর্শার ফলা আমূল বিঁধে গেল। শেষ নি:শ্বাসের ঘড়ঘড়ানি শোনা গেল সেখান থেকে।

তাঁর সঙ্গী আর অপেক্ষা করলো না, তাকে অনুসরণ করে খৃস্টান মেয়েটার গলায় চেপে ধরলো তার বর্শা। শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল তারও।

দু'জনেই বর্শা বের করে নিলো। উইগুসার ও মেয়েটার দেহ মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগলো। খলিল ও তার সাথী

দু'জনের বুকের ওপর ভারী জিনিস চাপিয়ে দিল।

দু'জনেরই ছটফটানি বন্ধ হয়ে গেলে নিথর লাশ দুটো পালংকের নিচে সরিয়ে দিল ওরা।

কামরাটি ছিল উইণ্ডসারের। দেয়ালে তার সামরিক পোশাক, মুখঢাকা হেলমেট।

হুমায়রা রাতের নাচের পোশাক বদলে দ্রুত সেই পোশাক ও হেলমেট পরে নিল। তার সারা শরীর পুরুষের পোষাকের নিচে ঢাকা পরে গেল। জুতাও পাল্টে নিল হোমায়রা। এখন আর কেউ চিনতে পারবে না, এমনকি ও যে মেয়ে মানুষ তাও বুঝতে পারবে না কেউ।

খলিল দরজা খুলে দেখলো বাইরে চাকর-বাকররা ঘোরাফেরা করছে। ওদিকে আমল দেয়ার সুযোগ নেই ওদের, তিনজনই বাইরে বেরিয়ে এলো। বেরিয়ে এসেই বাইরে থেকে দরজা টেনে একদিকে হাঁটা ধরলো ওরা।

শীঘ্রই তারা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়লো ওখান থেকে। কাছেই একটি ছোট গিরিপথ ছিল, গিরিপথ ধরে ওরা শাহী মহলের এলাকার বাইরে চলে এল।

খলিল ও তার সাথীর জানা ছিল, এখন তাদের কোথায় যেতে হবে। তাদের কমাণ্ডার একজন বড় আলেম, সেখানে তাদের থাকার গোপন ব্যবস্থাও আছে।

সে সময় শহর থেকে বের হওয়া বড় বিপদের ব্যাপার ছিল। নির্দিষ্ট ফটক দিয়ে বের হতে হতো সবাইকে। ফটকে থাকতো পাহারা। রাত একটু বেশী হলেই বন্ধ হয়ে যেতো ফটক। এখন ফটক পার হওয়া যাবে না, সে চেষ্টাও করলো না তারা। শহরের যে এলাকায় তাদের কমাণ্ডার থাকেন সেই আলেমের

বাড়ির দিকেই দ্রুত হেঁটে চললো ওরা।
তাদের ভয়, খুনের সন্ধান পাওয়ার সাথে সাথে শহরে হুলস্থুল পড়ে যাবে। ফটক বন্ধ করে তল্লাশী চালানো হবে শহরে। তার আগেই লুকাতে হবে তাদের।

খুনের ব্যাপার জানাজানি হতে দেরী লাগলো না। চাকর এসে উইগুসারকে কোথাও না পেয়ে তার কামরার দরজা খুললো। পালংকের নিচ থেকে রক্তের ধারা এসে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছিল। দরজা খুলেই আতকে উঠল চাকর।
ভয়ে চিৎকার জুড়ে দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো অন্যান্য চাকররা। রক্ত দেখে চিৎকার চেঁচামেচি ও হৈ চৈ শুরু করে দিল সবাই। সেখানে একটি নয়, দু'টি লাশ পড়ে ছিল। দু'জনের আঘাত একই রকম।
প্রহরীদের মাঝে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। তারা ভেবে পেলো না, সকলের উপস্থিতিতে একই সময়ে কে বা কারা এই জোড়া খুন করতে পারে?
সব প্রহরীদের ডাকলো কমাণ্ডার, দেখা গেল তাদের মধ্যে দু'জন প্রহরী অনুপস্থিত।

•

এ প্রাসাদ ছিল সংরক্ষিত। অনুমতি ছাড়া কারো প্রবেশ করার সাধ্য ছিল না এখানে। কেবল সম্ভ্রান্ত ও সম্মানী লোকরাই এখানে আসতে পারতো। তাদেরও চেকিং করে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হতো।
বডিগার্ড দু'জন কমাণ্ডারের জন্য বিপদ ডেকে আনল। এই খুন কোন পেশাদার খুনীর দ্বারাই সম্ভব। সুলতান আইয়ুবীর কমাণ্ডো

বাহিনী বা ফেদাইন খুনীচক্র ছাড়া এ কাজ কারো দ্বারা সম্ভব নয়।
কেউ একজন বললো, 'কারো কাছ থেকে টাকা খেয়ে এ কাজ কোন ভাড়াটে খুনীও করতে পারে।'
কমাণ্ডার বললো, 'হল ঘরের দু'জন প্রহরীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে এ খুন দু'টো যে ওদেরই কাজ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সম্ভবত তারা সুলতান আইয়ুবীর লোক ছিল। তা না হলে তারা সুলতানের লোকদের কাছ থেকে টাকা খেয়ে এ কাজ করেছে। উইণ্ডসার যেহেতু খৃস্টান গোয়েন্দা অফিসার, তার খুন হওয়ার পেছনে রাজনৈতিক কারণ ছাড়া অন্য কিছু থাকতে পারে না।'

গভীর রাত পর্যন্ত যখন খলিল ও তার সাথীর কোন খোঁজ শাহী চত্বরে পাওয়া গেল না, তখন শহরে তাদের তল্লাশী শুরু হয়ে গেল। অনেক পরে জানাজানি হলো, নতুন নর্তকীও তাদের সাথে উধাও হয়ে গেছে। তাদের গ্রেফতার করার জন্য সারা শহরে ব্যাপক তল্লাশী অভিযান শুরু হয়ে গেলো।
খলিল ও তার সঙ্গী হুমায়রাকে নিয়ে জায়গামত পৌঁছে গিয়েছিল। তারা তাদের কমাণ্ডারকে যখন সমস্ত ঘটনা খুলে বললো তখন তিনি জলদি তাদের গোপন স্থানে লুকিয়ে ফেললেন। বললেন, 'বাইরের অবস্থা আগে শান্ত হোক। তারপর তোমাদের কি করতে হবে জানাবো।'
এই কমাণ্ডার খুবই মশহুর আলেম হিসাবে পরিচিতি পেয়েছিলেন। যদিও এটা তার ছদ্মবেশ, তবু অভিনয় দক্ষতায় তিনি অসম্ভব কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তার কাছে দু'জন

শাগরেদ থাকতো, তারাও গোয়েন্দা। হলব থেকে দামেশকে তারাই সংবাদ আদান প্রদান করতো।
তিনি শাগরেদ দু'জনকে ডেকে বললেন, 'বাইরে কি হচ্ছে খোঁজ খবর নাও। উপযুক্ত সময় ও পরিবেশ তৈরী হলেই ওদের দামেশক পাঠিয়ে দিতে হবে।'

হুমায়রা কমাণ্ডারের সামনেই খলিলকে তার বিপদের কাহিনী শোনালো। শোনালো এ সাত আট বছর সে কোথায় ছিল, কি করেছে সব কথা। বললো, 'তুমি যখন বাবা ও লোক দু'জনের কাছে থেকে আমাকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করছিলে, তখন বাবা পিছন থেকে কোদালের গোড়ালী দিয়ে তোমার মাথায় আঘাত করে। এতে তুমি অজ্ঞান হয়ে যাও।
তখন তিনজনে ধরে আমাকে বাড়ি নিয়ে যায় এবং একজন কাজী ডেকে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই আমার বিয়ে পড়িয়ে দেয়। বিয়ে পড়ানো শেষ হলে লোক দু'টি আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে।
এক রাত ওরা দামেশকে কাটায়। পরদিন আমাকে এমন এক এলাকায় নিয়ে যায়, যেখানে শুধু খৃস্টানদের বসবাস ছিল। ওরা আমাকে নাচের ট্রেনিং দিতে শুরু করে।
প্রথম প্রথম আমি তাতে আপত্তি জানাই এবং বাধা দেয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু তাতে আমার ওপর এমন উৎপীড়ন নেমে আসে যে, মাঝে মধ্যে আমি অজ্ঞান হয়ে যেতাম। কিন্তু ওরা আমাকে উন্নত মানের খাবার দিত, সুস্বাদু শরবত পান করাতো। সেই শরবতে নেশা জাতীয় কিছু থাকতো, যার প্রভাবে আমার মনের জোর কমে যেতো এবং আমি আবার

নাচতে শুরু করতাম।
এই নেশার প্রভাব ও নির্যাতনই আমাকে নাচিয়ে বানিয়ে দিল। অনেক উঁচু স্তরের লোকেরা আসতে লাগলো আমার কাছে। তারা আমাকে এমন সব মূল্যবান উপহার দিত যে, সেগুলো দেখে আমি থ' বনে যেতাম।
ওরা আমাকে জেরুজালেম নিয়ে গেল। সেখানে দু'জন লোক আমার মালিককে বললো, 'যত টাকা লাগে নাও, মেয়েটাকে আমাদের হাতে দিয়ে দাও।'
তিনি এতে সম্মত হলেন না, তাদেরকে স্পষ্ট বলে দিলেন, 'এ মেয়েকে গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করাবো আমি।' ফলে তিনি তার কাছ থেকে কোন অর্থ নিলেন না।
একবার এক লোক আমাকে হাইজ্যাক করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেও ব্যর্থ হয়ে যায়। ফলে ওদের হাতেই থেকে যাই আমি। এখানে কোন আমীরের আদেশে আমকে ডেকে আনা হয়েছে।'
সে খলিলকে আরো জানালো, 'প্রথম যেদিন তোমাকে দেখেছি সেদিনই মন বলছিল, এ লোক খলিল। কিন্তু মনের ভেতর প্রশ্ন জাগলো, এখানে খলিল আসবে কোত্থেকে? ফলে মনের মধ্যে সন্দেহ ঘুরপাক খাচ্ছিল, খলিলের চেহারায় এ আবার অন্য কোন লোক নয়তো! তাই তোমাকে গভীরভাবে লক্ষ্য করতে লাগলাম। আমার ভাগ্য ভাল, উইণ্ডস্যারের কল্যাণে তোমাদের ব্যাপারে আমার সব সন্দেহ সংশয়ের অবসান ঘটলো।
কমাণ্ডারকে সে বললো, 'আমি এক জঘন্য জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম। আমার মনের সব আবেগ ও ভালবাসা মরে গিয়েছিল। এক পাথরের মূর্তির মত আমি নিজেকে

এদিক-ওদিক প্রদর্শনী করে বেড়াচ্ছিলাম। কিন্তু যখন খলিলকে দেখলাম, তখন আমার মনে আবার সেই কৈশোরের আবেগ জেগে উঠলো। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না, এই সে খলিল। কিন্তু তার চেহারা আমার মনে সেই সময়ের স্মৃতি জাগিয়ে দিল, যখন তার সঙ্গে আমার গভীর ভালবাসা ও প্রণয় ছিল।

আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম, তাকে জিজ্ঞেস করবো, তুমি কি খলিল? যদি সে নিজেকে খলিল বলে স্বীকার করে তবে তাকে বলবো, চলো আমরা কোথাও পালিয়ে যাই, প্রয়োজনে মরুভূমির যাযাবরদের মত জীবন-যাপন করি।

খলিলকে আমি পেয়ে গেলাম এবং তার সঙ্গে পালিয়েও এলাম। এখন হলব থেকে পালাতে পারলে বাঁচি।'

এ সিরিজের পরবর্তী বই

চারদিকে চক্রান্ত

আপনাদের মতামত

মোহতারাম, সালাম ও শুভেচ্ছা জানবেন। আপনাকে কি বলে যে শুভেচ্ছা জানাবো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আপনার লেখা ক্রুসেড সিরিজের দুটো বই পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। এক কথায় আমি অভিভুত হয়েছি। আমার এক বাংলাদেশী বন্ধু বই দুটো আমাকে পড়তে দিয়েছিল। বই দুটো পড়ে আমার ইচ্ছে করছে, জাতির প্রতিটি তরুণ ও কিশোরকে আমি এ বই পড়াই। ইসলামের মহান বীর গাজী সালাহউদ্দিনের জীবন কাহিনী এত বর্ণাঢ্য, এত শিক্ষণীয়, এত প্রেরণাদায়ক আমি আগে তা কল্পনাও করিনি। মুসলমানদের আজ যে দুর্দিন, এ দুর্দিন ঘুচাতে হলে এমনি সাহসী সৈনিকের আজ বড় প্রয়োজন। এ সিরিজের মাধ্যমে আপনি জাতির মনে সাহসের যে বীজ বপন করলেন, আমার বিশ্বাস তা বৃথা যাবে না। আমি তাকে বলেছি, দেশে গেলে সে যেনো এ সিরিজের সব কয়টি বই আমার জন্য নিয়ে আসে। আল্লাহর কাছে আপনার দীর্ঘ জীবন ও এমনি খেদমত করার তৌফিক কামনা করছি।

মাওঃ মুবাশ্বির হাসান

দারে জাদীদ, দারুল উলুম দেওবন্দ, সাহরানপুর, ইউপি, ভারত।

আপনার চিঠি পেয়ে খুশী হলাম। নতুন করে লেখার উৎসাহ ও উদ্দীপনা পেলাম। দোয়া করবেন মুসলিম মিল্লাতের জন্য যেন আজীবন এমনি করে কাজ করে যেতে পারি।

শ্রদ্ধাভাজনেষু

আমার আন্তরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সালাম গ্রহণ করিবেন। আপনার ক্রুসেড সিরিজ আমার খুব ভাল লাগে। এ পর্যন্ত আমি আটটি খণ্ড পড়েছি। আমি একজন স্কুল ছাত্র। আপনাদের ঘোষণা মতে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে এখানে একটি পাঠক ফোরাম গড়েছি। শহরে যে দোকান থেকে আমি এ বই কিনি তা আমাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে। সাইকেলে করে ১৪/১৫ মাইল দূরে ছুটে যাই এ বই কিনতে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ওয়াদামত প্রতি মাসে বই পাই না। এ পর্যন্ত ৯ নম্বর খণ্ড কিনতে পাঁচবার গিয়েও ব্যর্থ হইয়া ফিরে এসেছি। তাই ১০০ টাকা মানিঅর্ডার করে পাঠালাম। প্রতিটি খণ্ড বের হওয়ার সাথে সাথে ১কপি করে পাঠালে বাধিত হইব।

আবদুল মালেক

প্রযত্নে দেলোয়ার হোসেন মাস্টার, গ্রাম: নৈহাটি, রূপসা, খুলনা।

তোমার আগ্রহ দেখে আমরা সত্যি খুব খুশি হয়েছি। তোমার কষ্টের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আগামীতে আরো নিয়মিত করতে চেষ্টা করবো। তবে প্রতি মাসে নয়, একমাস পর পর বের করার ইচ্ছে আছে আমাদের। ৯ নম্বর খণ্ড উপকূলে সংঘর্ষ পাঠানো হলো। ১০ নম্বর বেরুলেই পাঠিয়ে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

পাঠকদের প্রতি–

✓এখন থেকে প্রতি এক মাস অন্তর এ সিরিজের একটি করে বই বেরোবে ইনশাইল্লাহ।

✓ প্রতি খণ্ডের দাম থাকবে ৩০/=।

✓ আমরা চাই আপনি আপনার পাশের দোকান থেকেই প্রতিটি কপি সংগ্রহ করুন। প্রয়োজনে দোকানদারকে বই সংগ্রহে উৎসাহিত করুন।

যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে–

✓ নিজে আহবায়ক হয়ে অন্তত দশ জন সদস্য নিয়ে 'ক্রুসেড পাঠক ফোরাম' গড়ে তুলুন এবং সিরিজটিকে আরো জনপ্রিয় করতে পরামর্শ পাঠান ও পদক্ষেপ নিন।

✓ অগ্রীম টাকা পাঠানোর ভিত্তিতে পাঠক ফোরামকে ৩০% কমিশনে বই সরবরাহ করা হয়। ডাক খরচ আমাদের। পাঠক ফোরাম ছাড়াও বিভিন্ন পাঠাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ সুযোগ ভোগ করতে পারেন।

✓ প্রতিটি খণ্ড বেরোনোর সাথে সাথে পাঠক ফোরামকে জানানো হয়।

বই বিক্রেতাদের প্রতি–

✓ জনপ্রিয় এ সিরিজের বই বিক্রি করে আপনিও হতে পারেন প্রচুর লাভবান। এজেন্ট ও বিক্রেতাদের সত্যিকার অর্থেই আশাতীত উচ্চ হারে কমিশন দেয়া হয়।

✓সিরিজটি ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পাওয়ায় আমরা সারা দেশে সহজ শর্তে এজেন্ট নিয়োগ করছি। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পাঠক ফোরামকে বই সরবরাহের দায়িত্বও এজেন্টগণ পালন করতে পারেন।

ঘোষণা

বিশ্বব্যাপী চলছে ইসলামী পূনর্জাগরণ।

চলছে ইসলাম বিরোধী শক্তির নির্যাতন–

হত্যা, গুম, খুন, ষড়যন্ত্র।

মুক্ত বিশ্বের মানুষ তার অনেক খবরই জানতে পারছে।

কিন্তু চীনের অবস্থা?

ওখানে কি কোন মুক্তি আন্দোলন নেই?

চীনের মুসলমানদের ওপর কি কোন নির্যাতন চলছে না?

চলছে।

কিন্তু সে খবর চীনের প্রাচীর ডিঙিয়ে

মুক্ত বিশ্বে আসতে পারছে না।

আর তাই দুনিয়ার মানুষ জানতে পারছে না

সেখানকার মুসলমানদের অবর্ণনীয় দুঃখ যন্ত্রণার কাহিনী।

তাওহীদুল ইসলাম বাবু

চীনের মুক্তিপাগল মানুষের মরণপণ সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে

লিখছেন এক নতুন রহস্য সিরিজ–

'অপারেশন'

আগামী মাসে বেরুচ্ছে এ সিরিজের ৪র্থ বই :

হাইনান দ্বীপে অভিযান

ক্রুসেড-১০
সর্প
কেল্লার
খুনী
আসাদ বিন হাফিজ